শ্রীঅরবিন্দের গীতা

তৃতীয় খণ্ড

(শ্রীঅরবিন্দের Essays on the Gita হইতে অনুবাদিত)

অনুবাদক—

শ্রীঅনিলবরণ রায়।

প্রকাশক—
শ্রীবিভূতি ভূষণ রায়
গীতা—প্রচার কার্য্যালয়
১০৮।৪, মনোহর পুকুর রোড, কালিঘাট,
কলিকাতা।

সোল্ এজেণ্ট
ডি, এম, লাইব্রেরী—
৬১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টাউন আর্ট প্রেস হইতে শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত, ১২১।এ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা।

নিবেদন

শ্রীঅরবিন্দের Essays on the Gita, Second series, হইতে অনুবাদিত এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটি "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেখান হইতেই পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। তজ্জন্য "ভারতবর্ষের" সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। চতুর্থ খণ্ড যথাশীঘ্র সম্ভব প্রকাশিত হইবে, এবং তাহাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি থাকিবে,—

গীতার পরম বাক্য; শক্তিতে ও লীলায় ভগবান; বিভূতি-তত্ত্ব; বিশ্বরূপ-দর্শন; পথ ও ভক্ত।

শ্রীঅনিলবরণ রায়

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম,
পণ্ডিচারী
৩০শে আগষ্ট, ১৯৩০।

সূচীপত্র

দুই প্রকৃতি

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় লইয়াই গীতা-শিক্ষার প্রথম ভাগ রচিত হইয়াছে। ঐ প্রথম ভাগটি গীতা-কথিত সাধনা ও জ্ঞানের প্রাথমিক ভিত্তি। সেই ভাবেই গীতার বাকী দ্বাদশ অধ্যায়কে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবিশিষ্ট দুইটি ভাগ রূপে লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগের শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া এই দুই ভাগে গীতাশিক্ষার বাকী অংশ পরিস্ফুট করা হইয়াছে। গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা তাত্ত্বিক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; এবং সেই বর্ণনাকে ভিত্তি করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির নিগূঢ় সমন্বয় করা হইয়াছে, ঠিক যেমন গীতার প্রথম ভাগে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করা হইয়াছে।—গীতার সমন্বয়ের এই অবস্থায় মাঝখানে একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনার দ্বারা এই সমন্বয়কে জীবন্ত ও পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে; এবং ইহার সহিত জীবন ও কর্ম্মের সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে সমস্ত শিক্ষাটীকে পুনরায় ঘুরাইয়া অর্জ্জুনের গোড়াকার প্রশ্নে লইয়া আসা হইয়াছে;—বাস্তবিক অর্জ্জুনের সেই প্রথম প্রশ্নই গীতার সমগ্র শিক্ষার কেন্দ্র এবং গীতা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই প্রশ্নটীরই চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছে। পরে ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে গীতা পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদ করিয়া গুণত্রয়ের ক্রিয়া, গুণাতীত হওয়া, নিষ্কাম কর্ম্ম কেমন জ্ঞানে পরিণত হইয়া ভক্তির সহিত মিলিত হয়—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি এই তিন মিলিয়া এক হয়—এই সব সম্বন্ধে নিজের মত পরিস্ফুট

করিয়াছে; এবং সেখান হইতে তাহার শিক্ষার মহান্ চূড়ান্ত কথায় উঠিয়াছে, বিশ্বপ্রভু ভগবানে আত্মসমর্পণের গুহ্যতম রহস্য ব্যক্ত করিয়াছে।

গীতার এই দ্বিতীয় খণ্ডে কথাগুলি যেমন সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে, প্রথম খণ্ডে সেরূপ দেখা যায় না। যে সকল সংজ্ঞার দ্বারা মূল সত্যটি বুঝিবার সূত্র পাওয়া যায়, প্রথম ছয় অধ্যায়ে সে সব সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই; সংশয় সকল যেমন উঠিয়াছে তেমনিই তাহাদের সমাধান করা হইয়াছে। সেখানে গীতার শিক্ষাটি যেন একটু কষ্টে সৃষ্টে অগ্রসর হইয়াছে এবং অনেক কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা হইয়াছে। অনেক এমন কথা আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাদের সার্থকতা স্পষ্ট বুঝা যায় না।—কিন্তু এই দ্বিতীয় খণ্ডে মনে হয়, আমরা যেন আরও পরিষ্কার ভূমি পাইয়াছি। এখানে কথাগুলি আর তেমন আল্‌গা আল্‌গা নহে,—সোজাসুজি, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ভাবেই বলা হইয়াছে। কিন্তু, আবার এই সংক্ষিপ্ততার জন্যই এখানে ভুলের সম্ভাবনা বেশী; এবং যাহাতে প্রকৃত অর্থটী হারাইয়া না ফেলি সেজন্য আমাদিগকে এখানে খুব সাবধানতার সহিতই অগ্রসর হইতে হইবে। কারণ, এখানে আর আমরা বরাবর মানসিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নিশ্চিত ভূমির উপরে নাই। এখানে অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যকে, এমন কি, বিশ্বাতীত সত্যকেও এমন ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, যেন তাহা মন-বুদ্ধির গোচর হইতে পারে। এরূপ তাত্ত্বিক (metaphysical statement) বর্ণনার মুস্কিল এই যে, যাহা বাস্তবিক অনন্ত, অসীম, তাহাকে সংজ্ঞার মধ্যে বাঁধিবার চেষ্টা করিতে হয়, সসীম সান্ত মনের গোচর করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এরূপ চেষ্টা করা দরকার হয় বটে, কিন্তু, ইহা কখনই বেশ সন্তোষজনক হইতে

পারে না, চরম ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যকে জীবনের মধ্য ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায়, দর্শন করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহার বর্ণনা কেবলমাত্র আংশিক ও অসম্পূর্ণই হইতে পারে। আধ্যাত্মিক ব্যাপারের বর্ণনা করিতে উপনিষদ্ যে পদ্ধতি ও ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, এ-সব বিষয়ে কেবলমাত্র তাহাই সমীচীন। উপনিষদ্ অবাধে রূপক ও উপমা ব্যবহার করিয়াছে, মানসিক বুদ্ধির উপযোগী সংজ্ঞা বাঁধিবার চেষ্টা না করিয়া সোজাসুজী প্রত্যক্ষদর্শনের ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে; এবং কথাগুলিকে অসীম ব্যঞ্জনা ও আভাষের দ্বারা সত্যের সঙ্কেত করিতে ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু, গীতা এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে নাই; কারণ, মনের সংশয়, বুদ্ধির সংশয় দূর করাই গীতার উদ্দেশ্য। মনের যে অবস্থায় বুদ্ধির মধ্যেই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, বুদ্ধি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না, অথচ আমাদের ভাব ও প্রেরণার মধ্যে বিরোধগুলির সমাধান করিতে সেই বুদ্ধিকেই সালিশ মানিতে হয়, সেই অবস্থার প্রয়োজনকে লক্ষ্য করিয়াই গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে। বুদ্ধিকে এমন সত্যে লইয়া যাইতে হইবে যাহা বুদ্ধির উপরে; কিন্তু, বুদ্ধির নিজের পদ্ধতি, নিজের ধরণ অনুসারেই তাহাকে চালাইতে হইবে। গীতা যে মীমাংসা দিয়াছে, অন্তর্জীবনের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক রহস্যের উপর তাহার ভিত্তি। সে ভিত্তি সম্বন্ধে বুদ্ধির কোন অভিজ্ঞতা নাই। অতএব, সেই মীমাংসার সার্থকতা সম্বন্ধে বুদ্ধিকে তুষ্ট করিতে হইলে, জীবনের যে সকল সত্যকে অবলম্বন করিয়া ঐ মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহাদের একটা যুক্তিযুক্ত বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক।

এ পর্য্যন্ত যে সকল সত্যের উল্লেখ করিয়া গীতা আপনার মত সমর্থন করিয়াছে, অর্জ্জুনের বুদ্ধির কাছে সেগুলি একবারে

নূতন নহে; এবং সেগুলি কেবল গোড়ার কথা। প্রথমে, আত্মার (the self) সহিত প্রকৃতিস্থ জীবের প্রভেদ করা হইছে। এই প্রভেদের দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, যতক্ষণ এই প্রকৃতিস্থ জীব (individual being in nature) অহঙ্কারের ক্রিয়ার মধ্যে বদ্ধ, ততক্ষণ সে গুণত্রয়ের অধীন থাকিবেই; মানুষের মন-বুদ্ধির যে ক্রিয়া তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণের যে ক্রিয়া, সে-সব এই গুণত্রয়ের সত্ত্ব, রজঃ, তমের অস্থির খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই গণ্ডীর মধ্যে কোনই সমাধান নাই।—প্রকৃত সমাধান পাইতে হইলে এই গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে; এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির উপরে উঠিয়া শান্ত, স্থির, অক্ষর আত্মাতে—ব্রহ্মে পৌঁছিতে হইবে; কারণ তখনই মানুষ সকল অনর্থের মূল অহঙ্কার ও বাসনার ক্রিয়াকে অতিক্রম করিবে। কিন্তু, এইভাবে মানুষ কি একেবারে নিষ্ক্রিয়তায় উপনীত হইবে না? প্রকৃতির বাহিরে ত কোথাও কর্ম্ম শক্তি নাই, কর্ম্মের কোনও প্রয়োজন বা প্রেরণা নাই; কারণ, অক্ষর ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়,—সকল বস্তু, সকল কর্ম্ম, সকল ঘটনার প্রতি সম ও নিরপেক্ষ। এইজন্যই গীতা যোগশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছে,—ঈশ্বর সকল কর্ম্মের, সকল যজ্ঞের প্রভু। গীতা এখানে স্পষ্টভাবে না বলিলেও ইঙ্গিত করিয়াছে যে, এই ঈশ্বর অক্ষর ব্রহ্মেরও উপরে এবং ঈশ্বরের মধ্যই বিশ্বলীলার নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে। অতএব ব্রহ্ম বা আত্মার ভিতর দিয়া ঈশ্বরে উঠিতে পারিলেই কর্ম্মের বন্ধন হইতে আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ করা যায়, অথচ প্রকৃতির মধ্য কর্ম্ম করা যায়। কিন্তু, এই যে পরমেশ্বর দিব্যগুরুরূপে দিব্যসারথিরূপে এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইনি কে এবং আত্মা বা ব্রহ্মের সহিত এবং প্রকৃতিস্থ জীবের সহিত ইহাঁর সম্বন্ধই বা কি, তাহা এখনও

প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই। আর, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে কর্ম্মের যে প্রেরণা আসে, তাহা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির প্রেরণা হইতে ভিন্ন কিসে, তাহাও এখনও পরিস্ফুট হয় নাই। এবং যদি উহা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিরই প্রেরণা ভিন্ন আর কিছু না হয়, তাহা হইলে উহার অনুসারে কর্ম্ম করিয়া জীব গুণত্রয়ের বন্ধন কেমন করিয়া এড়াইবে? তাহা হইলে যে মুক্তির ভরসা দেওয়া হইতেছে, তাহা কি মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ হইবে না? ভগবানের যেটা ক্রিয়ার দিক তাহাই প্রকৃতি, শক্তি, nature; তাহা হইতেই ইচ্ছা বা প্রেরণার উদ্ভব। তাহা হইলে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ছাড়াও তাহার উপরে কি আর কোনও প্রকৃতি আছে? অহঙ্কার, বাসনা, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, প্রাণের আবেগ—এই সব ব্যতীত কর্ম্মের, ইচ্ছার, বাস্তব সৃষ্টির কি আর কোন শক্তি আছে?

এখনও এই সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। অতএব দিব্যকর্ম্মের ভিত্তি হইবে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান আরও পূর্ণভাবে এখন বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। সকল কর্ম্মের মূল উৎস ভগবান সম্বন্ধে পূর্ণ সমগ্র জ্ঞানই এইরূপ দিব্য-কর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে। সেই জ্ঞান লাভ করিয়া কর্ম্মী ভগবানের সত্তাতেই মুক্ত হন; কারণ, তিনি সেই মুক্ত আত্মাকে জানেন, যাহা হইতে সকল কর্ম্মের উৎপত্তি; এবং তাহার মুক্তিতে মুক্তি লাভ করেন। তাহা ছাড়া, এই জ্ঞান হইতে এমন আলোক পাওয়া চাই, যেন গীতার প্রথম ভাগের শেষে যে কথা বলা হইয়াছে, তাহার সার্থকতা বুঝিতে পারা যায়। আধ্যাত্মিক চেতনা ও কর্ম্মের সকল প্রেরণার উপরে ভক্তির স্থান কেমন করিয়া হয়, এই জ্ঞানের মধ্যেই তাহার সমর্থন পাওয়া যাইবে। এই জ্ঞান হইবে সেই পরমেশ্বরের, সেই সর্ব্বভূতমহেশ্বরের, যাঁহার নিকটে জীব পূর্ণ

সমর্পণের সহিত নিজেকে নিবেদন করিতে পারে।—এই পূর্ণ আত্ম-নিবেদনই সকল প্রেম ও ভক্তির চূড়ান্ত—গুরু এইরূপ জ্ঞান দিবারই প্রস্তাব সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকগুলিতে করিলেন। এইখান হইতে যে তত্ত্বব্যাখ্যার সূত্রপাত হইল, তাহাই গীতার বাকী অংশে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিলেন—"আমাতে মন লাগাইয়া এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া (অর্থাৎ আমাকে তোমার সমস্ত চেতনা ও কর্ম্মের একমাত্র ভিত্তি ও অবলম্বন করিয়া) যোগ সাধনা করিলে তুমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়া সমগ্রভাবে আমাকে যেমন জানিতে পারিবে তাহা শ্রবণ কর। কোন কিছু বাকী না রাখিয়া, কোন কিছু বাদ না দিয়া আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহ এমন জ্ঞান বলিব, যাহা জানিলে এখানে তোমার অবিদিত আর কিছুই থাকিবে না।" (সপ্তম অধ্যায় ১—২)। এখানে সমগ্র জ্ঞান দিবার যে প্রস্তাব করা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, ভগবানই সব; অতএব ভগবানকে যদি তাঁহার সব সত্তায় এবং সব শক্তিতে জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে সবই জানা যায়। কেবল শুদ্ধ আত্মাকে নহে, পরন্তু জগৎকে, কর্ম্মকে, প্রকৃতিকেও জানা যায়। তখন আর এখানে জানিতে কিছুই বাকী থাকে না; কারণ, সবই সেই ভগবান। আমাদের জ্ঞান এখানে এরূপ সমগ্র নহে, এখানে জ্ঞান দ্বন্দ্বময় মন ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, অহঙ্কারের দ্বারা খণ্ডিত হয়। কেবল সেই জন্যই মনের দ্বারা যাহা আমারা উপলব্ধি করি, তাহা অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মানসিক দ্বন্দ্ব ও অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া আমাদিগকে সত্য অখণ্ড জ্ঞান লাভ করিতে হইবে; এবং ইহার দুইটি দিক আছে—জ্ঞান ও বিজ্ঞান। মূল তত্ত্বকে জানা—জ্ঞান; মূলতত্ত্বের বিকাশকে সর্ব্বতোভাবে জানাই বিজ্ঞান। পরম ভাগবত সত্তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই জ্ঞান এবং প্রকৃতি পুরুষ

[প্রভৃতি রূপে বিশ্বলীলার মাঝে ভগবানের যে আত্মপ্রকাশ হইয়াছে,সে সম্বন্ধে নিগূঢ় সত্যজ্ঞানই বিজ্ঞান। ইহার দ্বারা যাহা কিছু আছে সকল জিনিষেরই দিব্য উৎপত্তি এবং তাহাদের প্রকৃতির চরম সত্য জানিতে পারা যায়। গীতা বলিয়াছে এইরূপ পূর্ণ, সমগ্র জ্ঞান সুদুর্লভ,

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৭।৩

"সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কচিৎ দুই এক জন সিদ্ধিলাভে যত্নশীল হয়। আবার যাহারা এরূপ যত্ন করে এবং সিদ্ধিলাভ করে, তাহাদের মধ্যে কচিৎ দুই একজন তত্ত্বতঃ আমাকে জানে (knows me in all the principees of my existence)।

এই সমগ্র জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ গীতা প্রথমেই দুই প্রকৃতির, প্রাতিভাসিক (phenomenal) প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক (spiritual) প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ করিয়াছে। এই প্রভেদের উপরেই কার্য্যতঃ গীতার সমস্ত যোগপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৭।৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৭।৫

—"পঞ্চভূত (জড়সত্তার পঞ্চ অবস্থা), মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহাই আমার অষ্টধা ভিন্ন প্রকৃতি। ইহা অপরা ; কিন্তু, ইহা হইতে বিভিন্ন আমার অন্য এক প্রকৃতি আছে জানিও। তাহা পরা-প্রকৃতি। তাহাই জীব হইয়াছে এবং এই জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছে।" তত্ত্ববর্ণনায় এইটিই গীতার প্রথম নূতন কথা। ইহার সাহায্যেই গীতা সাংখ্যদর্শনের মত হইতে আরম্ভ করিয়াও সাংখ্যকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে ; এবং

সাংখ্যের বাক্যগুলিকে রাখিয়াও তাহাদের ব্যাপক ও বৈদান্তিক অর্থ দিতে পারিয়াছে। গীতা যে অষ্টধা প্রকৃতির বর্ণনা দিয়াছে, তাহাতে রহিয়াছে ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণসহ মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। গীতার এই বর্ণনা সাংখ্যেরই প্রকৃতির বর্ণনা। সাংখ্য এইখানেই থামিয়াছে এবং এইখানে থামিয়াছে বলিয়াই সাংখ্য আত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান তুলিতে বাধ্য হইয়াছে। সাংখ্যকে বলিতে হইয়াছে যে, এই দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদি বস্তু (primary entities)। গীতাও যদি এইখানে থামিত তাহা হইলে গীতাকেও আত্মা ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অনতিক্রমনীয় বিরোধ স্বীকার করিতে হইত; এবং তাহা হইলে বিশ্বপ্রকৃতি হইত কেবল ত্রিগুণময়ী মায়া; এবং এই বিশ্বপ্রপঞ্চ হইত কেবল মায়ার খেলা, আর কিছুই নহে। কিন্তু, আরও কিছু আছে—এক উচ্চতর তত্ত্ব, এক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি আছে, প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। ভগবানের এক পরমা প্রকৃতি আছে; তাহাই বিশ্বজগতের প্রকৃত মূল—আত্মা সৃজনী শক্তি ও কর্ম্মশক্তি। নীচের অজ্ঞান অপরা প্রকৃতি সেই পরা-প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত, তাহারই অন্ধকার ছায়া মাত্র। এই উচ্চতম লীলাস্তরে পুরুষ ও প্রকৃতি এক। সেখানে প্রকৃতি পুরুষেরই ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম্মশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে; প্রকৃতি পুরুষেরই লীলার দিক—পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে,—পুরুষই স্বয়ং শক্তিরূপে আবির্ভূত।

এই পরা-প্রকৃতি ভগবানের শক্তিরূপে কেবল যে বিশ্বলীলার মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহা নহে। কারণ, তাহা হইলে যে সর্ব্বব্যাপী আত্মা নিষ্ক্রিয়ভাবে সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে, সকল জিনিষের মধ্যে রহিয়াছে, সকলকেই ধরিয়া আছে, বিশ্বলীলা চলিতে একভাবে বাধ্য করিতেছে অথচ নিজে কিছুই করিতেছে না, সেই নিষ্ক্রিয় আত্মার

সহিত এই পরা-প্রকৃতির কোন প্রভেদই থাকিত না। এই পরা-প্রকৃতি সাংখ্যের অব্যক্তও নহে। ব্যক্ত অষ্টধা প্রকৃতির আদি অপ্রকাশিত বীজ অবস্থাই সাংখ্যের অব্যক্ত। সাংখ্যের মতে তাহাই প্রকৃতির একমাত্র মূল সৃজনী-শক্তি। তাহা হইতেই প্রকৃতির বিভিন্ন যন্ত্র ও ক্রিয়াশক্তির উদ্ভব। আবার অব্যক্ত তত্ত্বকে বৈদান্তিক মতে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলে চলিবে না যে, অব্যক্ত ব্রহ্ম বা আত্মার মধ্যে যে শক্তি বদ্ধ ও নিহিত রহিয়াছে, যাহা হইতে বিশ্বের উত্থান হইতেছে, যাহাতে বিশ্বের লয় হইতেছে, তাহাই এই পরা-প্রকৃতি। পরা-প্রকৃতি তাহা বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া আরও অনেক অধিক ; কারণ সেটি পরা-প্রকৃতির নানা আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্যে কেবল একটি অবস্থা। আত্মা ও জগতের পশ্চাতে পরমেশ্বরের যে চিৎশক্তি রহিয়াছে, তাহাই পরা-প্রকৃতি। অক্ষর পুরুষে ইহা আত্মার মধ্যে নিমজ্জিত। ইহা সেখানে রহিয়াছে কিন্তু কর্ম্ম করিতেছে না, নিবৃত্তিতে রহিয়াছে। ক্ষর পুরুষে এবং জগতে ইহা কর্ম্মে বহির্গত হইয়াছে,—প্রবৃত্তি। সেখানে প্রকটশক্তিরূপে থাকিয়া উহা আত্মার সত্তার মধ্যে সর্ব্বভূতের বিকাশ করিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে তাহাদের অন্তরতম আধ্যাত্মিক প্রকৃতিরূপে আবির্ভূত হইতেছে, তাহাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীন্ ঘটনা সমূহের পশ্চাতে স্থায়ী সত্যরূপে বিরাজ করিতেছে। উহাই ভূত সকলের আবির্ভাবের মূল গুণ ও শক্তি, তাহাদের বাহ্য-প্রকাশের পশ্চাতে অন্তরতম সত্তা এবং দিব্যশক্তি। সত্ত্বাদি গুণের যে দ্বন্দ্ব তাহা এই পরা-প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন নীচের খেলা, স্থূল খেলা। নামরূপের এসব খেলা, নীচের প্রকৃতির—মন, প্রাণ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধির খেলা, এসব কেবল প্রাতিভাসিক ঘটনা, phenomenon। ঐ আধ্যাত্মিক শক্তি পশ্চাতে না থাকিলে

এই প্রাতিভাসিক ঘটনা কখনই সম্ভব হইত না। ঐ শক্তি হইতেই এ-সব উঠিয়াছে, উহার মধ্যেই রহিয়াছে, এবং কেবল উহার দ্বারায় চলিতেছে। আমরা যদি শুধু এই প্রাতিভাসিক প্রকৃতির (phenomenal nature) মধ্যেই থাকি এবং এই প্রাতিভাসিক প্রকৃতি বস্তু সকলকে যেমন দেখায় শুধু তেমনি ভাবেই দেখি তাহা হইলে আমাদের কর্ম্ম-জীবনের প্রকৃত সত্যটি আমরা ধরিতে পারিব না। প্রকৃত সত্য হইতেছে এই আধ্যাত্মিক শক্তি, এই দিব্য প্রকৃতি, সকল বস্তুর অন্তরে এই আধ্যাত্মিক গুণ; অথবা বলা যাইতে পারে, যে আত্মার মধ্যে বস্তু সকল রহিয়াছে, যাহা হইতে তাহারা তাহাদের সকল শক্তি এবং কর্ম্মের বীজ পাইতেছে, ইহা সেই আত্মারই অন্তরতম গুণ। সেই সত্তাকে, শক্তিকে, গুণকে যদি আমরা ধরিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের জীবনযাত্রার সত্য নিয়মটি আমরা ধরিতে পারিব, আমাদের জীবনের দিব্য নীতিটি ধরিতে পারিব; কেবল জীবনের অজ্ঞান খেলায় মগ্ন না থাকিয়া, জ্ঞানের মধ্যেই ইহার যে মূল ও সার্থকতা আছে, তাঁহার সন্ধান পাইব।

এখানে যে ভাবে গীতার অর্থ বর্ণনা করা হইল, তাহা আমাদের বর্ত্তমান চিন্তাধারার, আধুনিক ধ্যান-ধারণার উপযোগী। কিন্তু, গীতা পরা প্রকৃতির যেরূপ বর্ণনা দিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, গীতা বস্তুতঃ এই কথাই বলিয়াছে। কারণ, প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, এই উপরের প্রকৃতি আমারই পরা-প্রকৃতি, প্রকৃতিম্ মে পরাম্। এখানে "আমি" বলিতে বুঝাইতেছে পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, বিশ্বাতীত এবং বিশ্বব্যাপী আত্মা। এই পরমাত্মার আদ্যা ও সনাতনী প্রকৃতি এবং ইঁহার বিশ্বাতীতা এবং সর্ব্বসৃষ্টির মূলস্বরূপা শক্তি—ইঁহাকেই পরা-প্রকৃতি বলা হইয়াছে।

কারণ, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁহার প্রকৃতির ক্রিয়াশীলা শক্তির দিক হইতে বিশ্বসৃষ্টির কথা বলিয়াছেন, "এতদ্ যোনিনী ভূতানি"—এই প্রকৃতি হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি। এবং এই শ্লোকেরই দ্বিতীয় পদে সকল সৃষ্টির মূল আত্মার দিক হইতে বিশ্বসৃষ্টির কথা বলিয়াছেন—"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা," "আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তির স্থল, আবার আমাতেই ইহার লয় হয়। আমা অপেক্ষা বড়, আমার উপরে আর কিছুই নাই"। অতএব এখানে পরমাত্মা পুরুষোত্তম এবং সর্ব্বোত্তমা প্রকৃতি পরা-প্রকৃতিকে একই করা হইয়াছে। এখান হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা একই সত্যের কেবল দুইটা দেখিবার ভঙ্গী মাত্র কারণ কৃষ্ণ যে বলিলেন—"আমিই জগতের উৎপত্তির স্থান, লয়েরও স্থান," তাঁহার পরা-প্রকৃতিই যে এই দুই স্থান তাহা বেশ বুঝা যায়। ভগবান তাঁহার অনন্ত চেতনাস্বরূপেই পরমাত্মা এবং পরামাত্মার অনন্ত শক্তি ও ইচ্ছাই পরা-প্রকৃতি,—পরমাত্মা তাঁহার অনন্ত চেতনার অন্তর্গত দিব্য তেজ এবং দিব্য কর্ম্ম স্বরূপেই পরা-প্রকৃতি। পরমাত্মার মধ্য হইতে এই চিৎশক্তির বিবর্ত্তন ও বিকাশ (the movement of evolution), পরা-প্রকৃতি জীবভূতা, ক্ষর-জগতে ইহার লীলা— ইহাই সৃষ্টি, প্রভবঃ; ক্রিয়াশক্তির প্রত্যাহারে অক্ষরের মধ্যে এই লীলার সংহরণ, পরমাত্মার আত্মস্থ শক্তিতে অবস্থান—ইহাই প্রলয়। তাহা হইলে পরা-প্রকৃতি বলিতে প্রথমতঃ ইহাই বুঝাইতেছে।

অতএব পরা-প্রকৃতি হইতেছে অনাদি ভাগবত সত্তার সেই অনন্ত কালাতীত চিৎশক্তি, যাহা হইতে জগতের যাবতীয় বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে এবং কালাতীত অবস্থা হইতে কালের মধ্যে বাহির হইয়াছে। কিন্তু জগতে এই বিচিত্র বহুমুখী বিশ্বলীলাকে ধারণ করিবার জন্য অধ্যাত্ম সত্তার প্রয়োজন; তাই পরা-প্রকৃতি জীবরূপে আবির্ভূত

হইয়াছে, জীবভূতা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। ইহাই অন্যভাবে বলা যায়, পুরুষোত্তমের নিত্য, সনাতন বহুধা আত্মা জগতে সমস্ত নামরূপের মধ্যে ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম সত্তারূপে আবির্ভূত হইয়াছে। এক অখণ্ড পরমাত্মার জীবনেই জগতের যাবতীয় বস্তু অনুপ্রাণিত। সেই এক পুরুষের সনাতন, বহুধা স্বরূপই সকলের ব্যক্তিত্ব, কর্ম্ম ও নামরূপকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে যেন আমরা না ভাবি যে, কালের মধ্যে যে-জীব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এবং পরা-প্রকৃতি এমনভাবে এক যে পরা-প্রকৃতি জীব ভিন্ন আর কিছুই নহে; উহা শুধুই প্রকাশস্বরূপ কিন্তু সৎস্বরূপ নহে। পরমাত্মার পরা-প্রকৃতি কখনও এই প্রকার হইতে পারে না। কালের মধ্যে যখন প্রকাশের লীলা চলিতেছে তখনও পরা-প্রকৃতি ইহা অপেক্ষা আরও বেশী কিছু; নতুবা জগতে উহার সত্তা কেবল বহুধাই হইত, জগতে একত্বের স্বরূপ থাকিত না। গীতা তাহা বলে নাই; গীতা বলে নাই যে, পরা-প্রকৃতি তাহার মূল সত্তায় জীব, জীবাত্মকম্। গীতা বলিয়াছে, পরা-প্রকৃতি জীব হইয়াছে, জীবভূতম্; এবং এই কথা হইতেই বুঝা যায় যে, জীবরূপে আবির্ভাবের পশ্চাতে পরা-প্রকৃতি মূলতঃ আরও কিছু, আরও উচ্চ সত্তা,—ইহা এক পরম আত্মারই স্বরূপ। পরে বলা হইবে যে, জীব ঈশ্বর, কিন্তু আংশিক প্রকাশরূপে ঈশ্বর, মমৈবাংশঃ। এমন কি জগতে যত জীব রহিয়াছে কিম্বা অসংখ্য জগতে যত অসংখ্য জীব রহিয়াছে, সেই সব মিলিয়াও পূর্ণ ভগবান নহে,—কেবলমাত্র সেই এক অনন্তের আংশিক প্রকাশ। তাহাদের মধ্যে এক অবিভক্ত ব্রহ্ম যেন বিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন,—অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। একত্ব উচ্চতর সত্য, বহুত্ব তাহার

নীচের সত্য, যদিও উভয়েই সত্য এবং উভয়ের কোনটাই মিথ্যা ভ্রম নহে।

এই অধ্যাত্ম প্রকৃতির একত্বের দ্বারাই জগৎ বিধৃত, যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ;—যেমন ইহা হইতেই সর্ব্বভূতসহ জগতের উৎপত্তিও হইয়াছে, এতদ্‌যোনীনি ভূতানী, এবং ইহাই প্রলয়কালে সর্ব্বভূতসহ সমগ্র জগৎকে নিজের মধ্যে টানিয়া লয়,—অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। কিন্তু, পরমাত্মার মধ্যে এই যে সৃষ্টি,স্থিতি ও লয়ের লীলা চলিতেছে,এই লীলায় জীবই বহুত্বের ভিত্তি। ইহাকে বহুধা আত্মা বলিতে পারা যায়। অথবা জগতে আমরা যে বহুত্ব দেখিতে পাই, জীবই তাহার আত্মা—ইহা বলিলেই বোধ হয় আরও ভাল হয়। এই জীব মূল সত্তায় সকল সময়েই ভগবানে সহিত এক ; কেবল লীলাশক্তিতেই ইহা ভগবান হইতে বিভিন্ন, বিভিন্ন বলিতে ইহা বুঝায় না যে,জীব আদৌ ঐ শক্তি নহে পরন্তু ইহাই বুঝায় যে, জীব সেই একই শক্তিকে আংশিক বহুধা ব্যষ্টিগত কর্ম্মে ধরিয়া আছে। অতএব সকল বস্তু আদিতে. অন্তে এবং স্থিতিকালেও সেই পরমাত্মা। সকলেরই মূল প্রকৃতি পরমাত্মার স্বরূপ, অধ্যাত্ম প্রকৃতি। কেবল নীচের বিশেষ লীলাতেই মনে হয় যেন তাহারা পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন ; মনে হয় শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়গণই বুঝি তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ। কিন্তু, এসব বাহিরের গৌণ প্রকাশ মাত্র,—ইহারা আমাদের প্রকৃতির এবং আমাদেব জীবনের নিগূঢ় সত্য নহে।

তাহা হইলে ভগবানের পরা প্রকৃতি বিশ্বের অতীত, জগতের এক মূল সত্য ও শক্তি; আবার সেই পরা-প্রকৃতিইবিশ্বমাঝে প্রকাশলীলার মূল ভিত্তি-স্বরূপ অধ্যাত্ম সত্য। কিন্তু তাহা হইলে এই পরা-প্রকৃতির সহিত নীচের প্রাতিভাসিক প্রকৃতির, অপরা-

প্রকৃতির সম্বন্ধের সূত্র কোথায় ? কৃষ্ণ বলিলেন,এ সব, এখানে যাহা কিছু আছে সে সমুদায়ই, আমাতে সূত্রে মণিগণের ন্যায় গ্রথিত, ময়ি সর্ব্বমিদং (৩) প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইইব। কিন্তু ইহা কেবল একটি উপমা, ইহাকে বেশী টানা চলে না; কারণ, মণিগণ সূত্রের দ্বারা এক সঙ্গে গ্রথিত থাকে মাত্র। সূত্রের সহিত তাহাদের একত্ব বা অন্য কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল সেইটিকে অবলম্বন করিয়া মণিগণ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব উপমা ছাড়িয়া দিয়া মূল জিনিষটিকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। পরমাত্মার পরা-প্রকৃতি, তাঁহার সত্ত্বার অনন্ত চিৎশক্তি, যাহা আত্মবিদ্, সর্ব্ববিদ্, সর্ব্বজ্ঞ, তাহাই এই প্রাতিভাসিক জগতের বস্তু সকলকে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়া সকলকে একত্র সাজাইয়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই এক পরা-শক্তি সকলের মধ্যে যে এক পরম বস্তু স্বরূপ আবির্ভূত হয় কেবল তাহাই নহে; পরন্তু প্রত্যেকের মধ্যে জীবরূপে, ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম সত্তারূপে আবির্ভূত হয়, আবার প্রকৃতির সকল গুণের সার সত্তারূপেও আবির্ভূত হয়। তাহা হইলে সকল ব্যক্ত রূপের পশ্চাতে ইহারাই গুপ্ত অধ্যাত্ম শক্তি। এই সর্ব্বোত্তম গুণ ত্রিগুণের ক্রিয়া নহে; ত্রিগুণের খেলা গুণের অভিব্যক্তি মাত্র, ইহার অধ্যাত্মিক সারসত্তা নহে। বস্তুতঃ-ইহা হইতেছে এই

(৩) জগৎলীলায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সমগ্রভাবে সেই সমুদায়কে বুঝাইতে উপনিষদে সাধারণতঃ "সর্ব্বমিদং" এই বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

সব বাহ্যিক পরিবর্ত্তনের অন্তর্নিহিত, এক অথচ বৈচিত্র্যশীল আভ্যন্তরীন শক্তি। প্রকাশলীলার ইহাই মূল সত্য। এই সত্যই সকল ব্যক্ত রূপকে ধরিয়া আছে; এবং সকলকে অধ্যাত্মিক ও দিব্য সার্থকতা প্রদান করিতেছে। ত্রিগুণের ক্রিয়া, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার, প্রাণ ও জড়দেহের বাহ্যিক চঞ্চল ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ; কিন্তু ইহা হইতেছে প্রকাশলীলার সার স্বরূপ, স্থির মূল নিগূঢ়শক্তি—স্বভাব। সকল প্রকাশলীলার এবং প্রত্যেক জীবের মূল ধর্ম্ম, স্ব-ধর্ম্ম ইহার দ্বারাই নির্ণীত হয়; ইহাই প্রকৃতির খেলার বিকাশ করে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে তত্ত্ব ভগবানের সর্ব্বোত্তম আত্মপ্রকাশলীলার সহিত (মদ্‌ভাবাঃ) সাক্ষাৎ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত, তাহাই এই। দিব্য ভাবের সহিত স্বভাবের এই সম্বন্ধ এবং স্বভাবের সহিত বাহ্যিক ভাবের সম্বন্ধ, দিব্য প্রকৃতির সহিত ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম প্রকৃতির সম্বন্ধ এবং শুদ্ধ মূল স্বরূপে ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম প্রকৃতির সহিত গুণত্রয়ের মিশ্রিত খেলা ও দ্বন্দ্বযুক্ত প্রাতিভাসিক প্রকৃতির সম্বন্ধ, এইখানেই আমরা উপরের দিব্য জীবন এবং নীচের প্রাকৃত জীবনের সম্বন্ধ সূত্র দেখিতে পাই। নীচের প্রকৃতির হীন শক্তি ও সম্পদসমূহ পরা-প্রকৃতির মহান্‌ শক্তি ও সম্পদসমূহ হইতেই উৎপন্ন, এবং সেইখানেই তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে; তবে তাহারা নিজেদের মূল ও সত্যের সন্ধান পাইবে, নিজেদের কর্ম্মের নিগূঢ় নীতির সন্ধান পাইবে। সেই রকম, জীব যে ত্রিগুণের শৃঙ্খলিত, ক্ষুদ্র, নীচ খেলায় বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে যদি সে মুক্ত হইতে চায় এবং দিব্যত্ত সিদ্ধ হইতে চায়, তাহা হইলে তাহার স্বভাবের মূল গুণকে অনুসরণ করিয়া তাহাকে তাহার নিজ সত্তার সেই উপরের ধর্ম্মে ফিরিয়া যাইতেই হইবে।

সেখানে সে তাহার দিব্য প্রকৃতির ইচ্ছা, শক্তি, কর্ম্মনীতি ও সর্ব্বোত্তম লীলার সন্ধান পাইবে।

ঠিক পরের শ্লোকগুলিতে এই কথাই আরও স্পষ্ট হইয়াছে। সেখানে গীতা কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছে, ভগবান জগতের সজীব এবং তথাকথিত নির্জীব পদার্থ সমূহের মধ্যে নিজের পরা-প্রকৃতির শক্তিতে কি ভাবে আবিভূ্ত হন। শ্লোকে ছন্দোবদ্ধভাবে প্রকাশ করিতে হইয়াছে বলিয়া সেগুলি ঠিক যুক্তিমত পরপর উল্লিখিত হয় নাই। এখানে আমরা সেগুলিকে যথার্থ ক্রমে সাজাইয়া দিতেছি। প্রথমতঃ, দিব্য-শক্তি ও দিব্য সত্তা পঞ্চভূতের মধ্যে, অর্থাৎ জড়ের পঞ্চ মূল অবস্থার মধ্যে আবিভূ্ত হইয়া কাজ করিতেছে। "আমি জলে রস, আকাশে শব্দ, পৃথিবীতে গন্ধ, অগ্নিতে তেজ," এবং আমরা এখানে যোগ করিয়া দিতে পারি, বায়ুতে স্পর্শ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পঞ্চভূত (৪) যে রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়ানুভূতির জড় আশ্রয়, স্বয়ং ভগবান নিজের পরা-প্রকৃতিতে সেই সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতির মূল শক্তি। জড়ের পাঁচটি মূল অবস্থা পঞ্চভূত। ইহারাই নীচের প্রকৃতিতে বস্তু স্বরূপ এবং ইহারাই জড়ের আকারভেদের আশ্রয়স্থল। পঞ্চ তন্মাত্র—রস,

---

(৪) প্রাচীন সাংখ্যদর্শনের মতে জড়ের পাঁচটি মূল অবস্থা (elemental or essenital conditons)—সূক্ষ্ম (ethereal), জ্যোতির্ম্ময় (radiant), বায়বীয় (gaseous), তরল (liquid), কঠিন (solid)—ইহাদিগকেই যথাক্রমে পঞ্চভূত নাম দেওয়া হইয়াছে—আকাশ, অগ্নি, বায়ু, জল, ও পৃথিবী। সাংখ্যমতে এই পঞ্চভূতই রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ানুভূতির জড় আশ্রয় (physical medium)।

স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি ইহারা গুণস্বরূপ। এই তন্মাত্রগুলি সূক্ষ্ম শক্তি। ইহাদের ক্রিয়ার দ্বারাই ইন্দ্রিয়-চৈতন্য জড়বস্তু সমূহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে সকল জ্ঞান ও অনুভূতির ইহারাই ভিত্তি। জড়বাদ অনুসারে জড়ই সদ্‌বস্তু, এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি জড় হইতেই উৎপন্ন। কিন্তু অধ্যাত্মবাদ অনুসারে ইহার উল্টাটাই সত্য। জড় বস্তু এবং জড় আধার ইহারা নিজেই উদ্ভূত শক্তি। জীবের ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিকট প্রকৃতির গুণসমূহের ক্রিয়া যে স্থূলভাবে প্রকট হয়, জড় মূলতঃ সেই স্থূলভাব বা অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক মূল সনাতন সত্য হইতেছে প্রকৃতির শক্তি। তাহাই ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিতর দিয়া জীবাত্মার সম্মুখে নানা রূপে প্রকট হয়। আবার ইন্দ্রিয়েরও যে সার শক্তি, গভীরতম আধ্যাত্মিক শক্তি, সূক্ষ্মতম শক্তি, তাহাও ঐ সনাতন শক্তিরই অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু প্রকৃতির যে-শক্তি, নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত স্বয়ং ভগবানই সেই শক্তি; অতএব প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই শুদ্ধ সত্তায় সেই ভাগবত প্রকৃতি,—ভগবানই তাঁহার নিজ সচেতন লীলাশক্তিতে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হইয়াছেন।

এই শ্রেণীতে উল্লিখিত অন্যান্য বস্তু হইতে ইহা আরও স্পষ্ট বুঝা

(৪) প্রাচীন সাংখ্যদর্শনের মতে জড়ের পাঁচটি মূল অবস্থা (elemental or essential conditions)—সূক্ষ্ম (ethereal), জ্যোতির্ময় (radiant), বায়বীয় (gaseous), তরল (liquid), কঠিন (solid)—ইহাদিগকেই যথাক্রমে পঞ্চভূত নাম দেওয়া হইয়াছে—আকাশ, অগ্নি, বায়ু, জল, ও পৃথিবী। সাংখ্যমতে এই পঞ্চভূতই রূপ, রস প্রভৃতিই ন্দ্রিয়ানুভূতির জড় আশ্রয় (physical medium)।

যায়। "আমি চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রভা, মানুষের পৌরুষ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ, বলবানদের বল, তপস্বীর তপঃশক্তি।" "আমি সর্ব্বভূতের জীবন।" এই সকল বস্তু যাহা হইয়াছে, তাহা হইবার জন্য শক্তির যে মূল গুণের উপরে উহারা নির্ভর করে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেই শক্তিকেই নির্দ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহাদের প্রকৃতিতে ভাগবত শক্তির অধিষ্ঠানের ঐটিই স্বরূপ লক্ষণ। আবার, "আমি সর্ব্ববেদে প্রণব" অর্থাৎ মূলশব্দ ওঁ। এই ওঁকারই শ্রুতির সকল শক্তিশালী সৃজনক্ষম শব্দের মূল ভিত্তি;শব্দ ও বাক্যের যে শক্তি তাহারই সর্ব্বসাধারণ রূপটি হইতেছে ওঁ। এই ওঁকারের মধ্যে বাক্ ও শব্দের সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি ও বিকাশ-সম্ভাবনা সংক্ষেপে নিহিত রহিয়াছে। অন্যান্য যে-সব শব্দ ভাষার উপাদান, সে সকল এই মূল ওঁকারেরই ক্রমবিকাশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করা হয়। এইবার কথাটি খুব পরিষ্কার হইল ইন্দ্রিয়গণের বা জীবনের বা জ্যোতির, বুদ্ধি, তেজ, বল, পৌরুষ বা তপঃশক্তির যে বাহ্য ব্যক্ত ভাব ও বিকাশ, তাহা পরা-প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ নহে। মূল গুণের যে আধ্যাত্মিক শক্তিকে লইয়া স্ব-ভাব, তাহাই পরা-প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ। আত্মার যে শক্তি এই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, আত্মার চেতনার যে জ্যোতি এবং ব্যক্ত জিনিষে ইহার তেজের যে শক্তি, তাহাই মূল শুদ্ধ লক্ষণে হইতেছে অধ্যাত্ম প্রকৃতি। সেই শক্তি, জ্যোতিই সনাতন বীজ, তাহা হইতেই আর সব জিনিষ উদ্ভূত ও বিকশিত হইয়াছে,—আর সব জিনিষ তাহারই বিচিত্র লীলা। অতএব গীতা খুব সাধারণভাবে বলিয়াছে, বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্। "হে পৃথার পুত্র, আমাকেই সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিও।" এই সনাতন বীজ আত্মার শক্তি; আত্মাতে সচেতন ইচ্ছা, ভগবান এই বীজ মহদ্ ব্রহ্মে নিক্ষেপ করেন এবং তাহা হইতেই সর্ব্বভূতের

আবির্ভাব হয়। আত্মার এই বীজই সর্ব্বভূতের মূল গুণরূপে আবিভূর্ত হয় এবং তাহাদের স্বভাব হয়।

মূল গুণের এই আদি শক্তির সহিত নীচের প্রকৃতিতে উদ্ভূত ব্যক্ত রূপের যে প্রভেদ, বস্তু শুদ্ধ স্বরূপে যাহা (the thing itself) এবং নিম্নতরক্রমে উহা যেরূপ দেখায় (the thing in its lower appear-ance), এই দুয়ের যে প্রভেদ, তাহাই শেষকালে অতি স্পষ্টভাবেই দেখান হইয়াছে—

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্।—
—"বলবানদিগের কাম ও আসক্তিবর্জ্জিত বল আমি।"
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ!
—"জীবগণের মধ্যে যে কাম তাহাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে,

আমিই সেই কাম।" আর উপরের প্রকৃতি হইতে যে সকল জিনিষ নীচের প্রকৃতিতে আবিভূর্ত হইয়াছে, ভাবাঃ, (মনের ভাব, বাসনার অনুরাগ, রিপুর প্রেরণা, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ের উপর প্রতিক্রিয়া, বুদ্ধির সীমাবদ্ধ ও দ্বন্দ্বময় খেলা, হৃদয়ের নানা অনুভূতি এবং পাপ পুণ্য বিবেক), যে সকল ভাব সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই যে সব ত্রিগুণের খেলা গীতা বলিয়াছে, তাহারাই পরা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির স্বরূপের খেলা; কিন্তু তাহা হইতে উদ্ভূত; "মত্ত এব," আমা হইতেই যে তাহাদের উৎপত্তি তাহা সত্য, তাহারা অন্য কোথাও হইতে আসে নাই, তবে ন ত্বহং তেষু তে ময়ি, আমি তাহাদের মধ্যে নাই, তাহারাই আমার মধ্যে রহিয়াছে। তাহা হইলে এখানে একটা বেশ প্রভেদ দেখা যাইতেছে, যদিও বই সূক্ষ্ম। ভগবান বলিলেন, "আমিই মূল জ্যোতি, তেজ, কাম, বল,

বুদ্ধি। কিন্তু, এই সব হইতে নীচের প্রকৃতিতে যাহা উদ্ভূত হইয়াছে আমি মূলতঃ তাহা নই, এবং তাহাদের মধ্যেও আমি নাই। তবে তাহারা সকলেই আমা হইতে উদ্ভূত এবং আমার সত্তার মধ্যেই রহিয়াছে।” অতএব এই কথাগুলির উপরে নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, উপরের প্রকৃতি হইতে সব জিনিষ নীচের প্রকৃতিতে কেমন করিয়া আসে, আবার নীচের প্রকৃতি হইতে কেমন করিয়াই বা উপরের প্রকৃতিতে ফিরিয়া যায়।

প্রথম কথাটিতে কোন গোলমাল নাই। বলবান পুরুষের যে বল তাহার স্বরূপ মূলতঃ দিব্য; তাহা সত্ত্বেও ঐ পুরুষ কাম ও আসক্তির অধীন হইয়া পড়ে, পাপে পতিত হয় এবং দ্বন্দ্ব করিতে করিতে পুণ্যের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু, এরূপ যে হয় তাহার কারণ সে তাহার জীবনের কর্ম্মে ত্রিগুণের কবলে নামিয়া পড়ে; উপর হইতে নিজের মূল দিব্য প্রকৃতি হইতে সেই কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে না। তাহার এই সব নীচের খেলার জন্য তাহার শক্তির দিব্যস্বরূপের কোনই হানি হয় না। সমস্ত অজ্ঞান, মোহ, সমস্ত স্খলন সত্ত্বেও মূলতঃ তাহা ঠিক একই থাকে। তাহার সেই দিব্য প্রকৃতিতে ভগবান অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যতক্ষণ না সে পুনরায় জ্ঞানলাভ করিতে পারে, নিজের সত্তার প্রকৃত সূর্য্যালোকে তাহার সমস্ত জীবনকে আলোকিত করিতে এবং তাহার উপরের প্রকৃতিতে অবস্থিত ভাগবত ইচ্ছার শুদ্ধ শক্তির দ্বারা তাহার ইচ্ছা এবং কর্ম্ম সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হয়, ততক্ষণ তিনিই নিজের শক্তির দ্বারা তাহাকে তাহার নীচের জীবনের সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছেন, রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু, ভগবান কেমন করিয়া কাম

হইতে পারেন? এই কামকেই যে বলা হইয়াছে আমাদের একমাত্র পরম শত্রু, ইহাকে বধ করিতেই হইবে! কিন্তু, সে কাম হইতেছে ত্রি ণময়ী নীচের প্রকৃতির কাম। তাহার উৎপত্তি হইতেছে রজঃ গুণ হইতে—রজোগুণসমুদ্ভবঃ; কারণ কাম বলিতে সচরাচর আমরা এইটিকেই বুঝি। কিন্তু অপরটি আধ্যাত্মিক। সে কাম বা ইচ্ছা ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে।

আধ্যাত্মিক কাম বলিতে কি বুঝিতে হইবে পুণ্য-কামনা, নীতি-ধর্ম্মের অনুযায়ী সাত্ত্বিক (৫) কামনা? কিন্তু, তাহা হইলে এখানে একটা স্পষ্ট বিরোধ হয়; কারণ, পরের ছত্রেই বলা হইয়াছে যে, সাত্ত্বিকভাব সকল দিব্যভাব নহে, তাহারা শুধু নীচের খেলা। অবশ্য পাপকে বর্জ্জন করিতেই হইবে নতুবা কেহ ভগবানের ধার পর্য্যন্তও যাইতে পারিবে না; কিন্তু, তেমনিই পুণ্যেরও উপরে উঠিতে হইবে; নতুবা আমরা ভাগবত সত্তায় প্রবেশলাভ করিতে পারিব না। সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ করিতে হইবে কিন্তু, তাহার পর ইহারও উপরে উঠিতে হইবে। নীতিধর্ম্মের অনুযায়ী কর্ম্ম আত্মশুদ্ধির কেবল একটা উপায় মাত্র, ইহার দ্বারা আমরা দিব্যপ্রকৃতির দিকে উঠিতে পারি, কিন্তু সেই প্রকৃতি নিজে পাপপুণ্য সকল দ্বন্দ্বের অতীত,—বাস্তবিক তাহা না হইলে যে শক্তিমান পুরুষ রাজসিক কাম-ক্রোধের অধীন হইয়া পড়িয়াছে তাহার মধ্যে কোন খাঁটি দিব্য সত্তা, বা দিব্য শক্তি থাকিতেই পারিত না। ধর্ম্মের যে আধ্যাত্মিক অর্থ তাহাতে উহা নৈতিকতা বা নীতিধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র জিনিষ। গীতা অন্যত্র বলিয়াছে, স্বভাবের দ্বারা, স্ব-প্রকৃতির মূলনীতির দ্বারা

(৫) কারণ পুণ্য সকল সময়েই মূলতঃ এবং কার্য্যতঃ সাত্ত্বিক।

নিয়ন্ত্রিত যে কর্ম্ম, স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম। আর এই স্বভাব মূলতঃ আত্মারই শুদ্ধ গুণ। আত্মার অন্তর্নিহিত যে সজ্ঞান ইচ্ছা এবং নিজস্ব কর্ম্মশক্তি তাহারই ভাব, স্বভাব। অতএব গীতা এখানে যে কামের কথা বলিয়াছে তাহা আমাদের মধ্যে ভগবানেরই নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইচ্ছা, তাহা নীচের প্রকৃতির ভোগসুখের লালসা নহে, তাহা ভগবানেরই লীলার আনন্দের, আত্মপ্রকাশের আনন্দের সন্ধান। জীবনলীলার যে দিব্য আনন্দ স্বভাবের নিয়ম অনুসারে নিজস্ব সজ্ঞান কর্ম্মশক্তিকে প্রকট করিতে চাহিতেছে, ইহা সেই দিব্য আনন্দের কামনা।

কিন্তু তাহা হইলে আবার একথা বলার অর্থ কি যে,নীচের প্রকৃতির ভাব, রূপ, বিকার সকলের মধ্যে ভগবান নাই, এমন কি সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যেও ভগবান নাই, যদিও সে সব ভগবানের মধ্যেই রহিয়াছে, ন ত্বহং তেষু তে ময়ি? ভগবান যে কোন না কোন ভাবে এই সবের মধ্যেই রহিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, নতুবা তাহাদের অস্তিত্বই সম্ভব হইত না। এখানে কেবল ইহাই বুঝাইতেছে যে, ভগবানের যে সত্য পরা অধ্যাত্ম প্রকৃতি, তাহা এই সবের মধ্যে আবদ্ধ নহে; এ সব কেবল প্রাতিভাসিক ব্যাপার, অহঙ্কার ও অজ্ঞানের ক্রিয়ার দ্বারা তাঁহার মধ্যে তাঁহার সত্তা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। অজ্ঞান আমাদিগকে প্রত্যেক জিনিষ উল্টা ভাবে দেখায় এবং এমন অনুভূতি উপলব্ধি দেয় যাহা অন্ততঃ কতকটা বিকৃত। আমরা মনে করি যে, জীবাত্মা শরীরের মধ্যে রহিয়াছে, যেন উহা শরীরেরই পরিণাম এবং শরীর হইতেই উৎপন্ন; আমাদের অনুভূতিও এইরূপই হয়। কিন্তু বস্তুতঃ শরীরই জীবাত্মার মধ্যে

রহিয়াছে, শরীর আত্মার পরিণাম, আত্মা হইতেই উদ্ভূত। আমরা মনে করি, এই বিশাল জড় জগৎ ও মনোজগতের মধ্যে আত্মা যেন আমাদেরই একটা ক্ষুদ্র অংশ, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ। কিন্তু বস্তুতঃ জগৎটা যত বড়ই দেখাক না কেন, আত্মার অনন্ত সত্তার মধ্যে উহা একটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জিনিষ। এখানেও তাই; অনেকটা ঠিক এই ভাবেই এই সব জিনিষ ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে, পরন্তু ভগবান ইহাদের মধ্যে নাই। এই যে ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতি জিনিষ সকলকে এইরূপ মিথ্যাভাবে দেখায় এবং তাহাদের স্বরূপকে হীন করিয়া দেয় ইহা মায়া, একটা ভ্রমোৎপাদিকা শক্তি; তাই বলিয়া বুঝায় না যে, এ-সবের কোন অস্তিত্বই নাই, এ সবই মিথ্যা। কথা এই যে, ইহা আমাদের জ্ঞানকে বিভ্রান্ত করে, জিনিষের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে দেয় না, আমাদিগকে অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয়, দেহ, খণ্ডিত বুদ্ধির মধ্যে ঢাকিয়া রাখে, আমাদের জীবনের পরম সত্য আমাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখে। আমরা যে দিব্য অনন্ত অক্ষয় আত্মা,—মায়া তাহা আমাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখে।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ৭।১৩

—"এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব-সকলের দ্বারা সমস্ত জগৎ বিভ্রান্ত হয়, এবং ইহাদের অতীত পরম অক্ষয় বস্তু আমাকে চিনিতে পারে না।" যদি আমরা দেখিতে পাইতাম যে, ভগবানই আমাদের জীবনের প্রকৃত সত্য, তাহা হইলে আর সবকেই আমরা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতাম, তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের নিকট ধরা পড়িত,

এবং আমাদের জীবন ও কর্ম্ম দিব্যভাব প্রাপ্ত হইত, দিব্যপ্রকৃতির নীতি অনুসারে পরিচালিত হইত।

কিন্তু যাহাই হউক, ভগবান এবং ভাগবত প্রকৃতি যখন এই সকল বিভ্রান্ত ব্যাপারের মূলে রহিয়াছেন, যখন আমরাই জীব এবং জীবই সেই, তাহা হইলে এই মায়াকে অতিক্রম করা এত কঠিন কেন—মায়া দুরত্যয়া? ইহার কারণ এই যে, এই মায়া ভগবানেরই মায়া, দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া, "এই গুণময়ী মায়া আমারই দৈবী মায়া।" ইহা নিজে দিব্য, এবং ভগবানের প্রকৃতি হইতে বিকশিত, কিন্তু দেবতারূপী ভগবানের প্রকৃতি হইতে; ইহা দৈবী, দেবতাদের অথবা বলিতে পার, দেবতার; কিন্তু দেবতার যে দ্বন্দ্বময় নীচের জাগতিক খেলা, সাত্ত্বিক,রাজসিক,তামসিক ইহা তাহাই। এই জাগতিক মায়ার আবরণ দেবতা আমাদের বুদ্ধির চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছেন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই আবরণের জটিল সূত্র বয়ন করিয়াছেন; শক্তি, পরা প্রকৃতি ইহার ভিত্তি এবং ইহার প্রত্যেক অংশে অনুস্যূত রহিয়াছে। আমাদিগকে আমাদের মধ্যে এই মায়ার জাল খুলিতে হইবে, ইহার প্রয়োজন শেষ হইলে ইহাকে ভেদ করিয়া, ইহাকে ছাড়িয়া, পিছনে ফেলিয়া, দেবতাদিগকে ছাড়াইয়া সেই এক দেবাদিদেব পরমেশ্বরের দিকে ফিরিতে হইবে। তাঁহার মধ্যে আমরা দেবতাগণের এবং তাঁহাদের কার্য্যের চরম সার্থকতার সন্ধান পাইব এবং আমাদের অক্ষয় জীবনেরও অন্তরতম আধ্যাত্মিক সত্য সকলের সন্ধান পাইব।

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

— "আমার দিকে যাহারা ফিরিয়া আইসে কেবল তাহারাই এই মায়া অতিক্রম করিতে পারে।"

ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়।*

গীতায় প্রসঙ্গক্রমে বহু দার্শনিক তত্ত্ব স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু গীতা দার্শনিক তত্ত্বালোচনার গ্রন্থ নহে ; কারণ, গীতাতে শুধু আলোচনার জন্যই কোন তত্ত্বের অবতারণা করা হয় নাই। গীতা শ্রেষ্ঠ সত্যের সন্ধান করিয়াছে, যেন তাহা শ্রেষ্ঠ কাজে লাগান যাইতে পারে ; কেবল তর্কবুদ্ধি বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তির জন্য নহে, কিন্তু যেন ঐ সত্য আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে, আমাদের বর্ত্তমান মরজীবনের অপূর্ণতা হইতে আমাদিগকে মৃত্যুহীন পূর্ণতার মধ্যে লইয়া যাইতে পারে। অতএব এই (সপ্তম) অধ্যায়ের প্রথম চতুর্দ্দশ শ্লোকে আমদের পক্ষে প্রয়োজনীয় একটি মূল দার্শনিক সত্যের বর্ণনা করিয়া, ইহার পরেই যোলটি শ্লোকে উহার প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই সত্যকে লইয়াই গীতা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের সূচনা করিয়াছে ; ইহার পূর্ব্বে শুধু কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে যে সমন্বয়ের প্রয়োজন, তাহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে সম্পাদিত হইয়াছে।

আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তিনটি শক্তি (Powers)—পুরুষোত্তম, আত্মা ও জীব (আমাদিগকে যে পরিণতি লাভ করিতে হইবে তাহারই চরম সত্য হইতেছে পুরুষোত্তম)। এই তিনটিকে অন্য ভাবে বলা যাইতে পারে—পরাৎপর (the Supreme), নামরূপের অতীত আত্মা (the impersonal spirit), এবং বহুরূপী জীবাত্মা (the multiple

---

* গীতা, সপ্তম অধ্যায়, ১৫—২৮শ্লোক

oul), যাহা আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের কালাতীত ভিত্তি, সত্য ও সনাতন ব্যষ্টি—মমৈবাংশঃ সনাতনঃ। এই তিনটিই ভাগবত সত্তা। সর্ব্বোত্তমা যে অধ্যাত্মিক প্রকৃতি, অবিদ্যার সকল খণ্ডতা হইতে মুক্ত যে পরাপ্রকৃতি, তাহাই পুরুষোত্তমের প্রকৃতি। নির্ব্যক্তিক নামরূপের অতীত আত্মাতে সেই দিব্য প্রকৃতিই রহিয়াছে; কিন্তু এখানে উহা রহিয়াছে চির-বিশ্রামের অবস্থায়,—সাম্য, নিষ্ক্রিয়তা, নিবৃত্তির অবস্থায়। পরিণামে ক্রিয়ার জন্য, প্রবৃত্তির জন্য পরাপ্রকৃতি বহুরূপী আত্মা (the multiple spiritual personality) হইয়াছে, জীব হইয়াছে। কিন্তু এই উত্তমা প্রকৃতির যে নিগূঢ় ক্রিয়া তাহা সকল সময়েই আধ্যাত্মিক দিব্য ক্রিয়া। দিব্য পরা প্রকৃতির শক্তিই, ভগবানের সচেতন ইচ্ছাই জীবের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক গুণশক্তিরূপে আবির্ভূত হয়; সেই মূল শক্তিই জীবের স্বভাব। যে সব কর্ম্ম ও ভাব (becoming) সাক্ষাৎভাবে এই আধ্যাত্মিক শক্তি হইতে উদ্ভূত সে সকলই দিব্যভাব এবং শুদ্ধ ও আধ্যাত্মিক কর্ম্ম। তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, দিব্যভাবে কর্ম্ম করিতে হইলে মানুষকে তাহার সত্য আধ্যাত্মিক স্বরূপে ফিরিয়া যাইতে, এবং তাহার সকল কর্ম্মকে পরাপ্রকৃতি হইতেই প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে; যেন আত্মার ভিতর দিয়া এবং অন্তরতম নিগূঢ় সত্তার ভিতর দিয়াই কর্ম্মের বিকাশ হয়, মনের চিন্তা ও প্রাণের বাসনার ভিতর দিয়া নহে; যেন তাহার সকল কর্ম্ম ভগবদ্ ইচ্ছারই শুদ্ধ প্রবাহে পরিণত হয়, তাহার সমস্ত জীবন দিব্য প্রকৃতির জীবন্ত বিগ্রহে পরিণত হয়।

কিন্তু আবার ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতিও রহিয়াছে; ইহার স্বরূপ হইতেছে অজ্ঞানের স্বরূপ এবং ইহার কর্ম্ম হইতেছে অজ্ঞানের কর্ম্ম, মিশ্রিত, ভ্রান্ত, বিকৃত। এই কর্ম্ম নীচের সত্তার কর্ম্ম, "অহং"য়ের

কর্ম্ম,—ইহা আধ্যাত্মিক ব্যক্তির কর্ম্ম নহে, প্রাকৃত ব্যক্তির কর্ম্ম। এই নীচের মিথ্যা ব্যক্তিত্ব (false personality) হইতে উপরে উঠিবার জন্যই আমাদিগকে নামরূপের অতীত নির্ব্যক্তিক আত্মাকে(the impersonal self) ধরিতে হয় এবং তাহার সহিত নিজদিগকে এক করিতে হয়। তখন, এইভাবে অহংয়ের ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আমরা পুরুষোত্তমের সহিত সত্য ব্যষ্টির সম্বন্ধটী আবিষ্কার করিতে পারি। কর্ম্মে এবং প্রকৃতির কালাধীন বিকাশে ইহা পুরুষোত্তমের অংশ ও বিশেষ রূপ মাত্র। এরূপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কারণ ইহা ব্যষ্টি। তথাপি মূল সত্তায় ইহা পুরুষোত্তমের সহিত এক। আবার, নীচের প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইলে আমরা উপরের দিব্য আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। অতএব আত্মা হইতে কর্ম্ম করার অর্থ ইহা নহে যে, বাসনাময় আত্মা হইতে কর্ম্ম করা ; কারণ, এই বাসনাময় আত্মা উপরের নিগূঢ় বস্তু নহে ; ইহা কেবল নীচের প্রাকৃত ও বাহ্য রূপ, সত্য বস্তুর আভাস বা ছায়া। নিগূঢ় প্রকৃতি অনুসারে, স্বভাব অনুসারে কর্ম্ম করার অর্থ ইহা নহে যে, অহংয়ের কাম-ক্রোধদি রিপুর বশে কর্ম্ম করা, নির্ব্বিকার চিত্তে অথবা আসক্তির সহিত প্রাকৃত প্রেরণা অনুসারে ও গুণত্রয়ের চঞ্চল খেলা অনুসারে পাপ-পুণ্যের অনুষ্ঠান করা। রিপুর বশীভূত হওরা, স্বেচ্ছায় বা জড়তার বশে পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া—ইহা উচ্চতম নির্ব্যক্তিক (highest impersonality) সত্তার আধ্যাত্মিক শান্ত নিষ্ক্রিয়ভাব লাভের পথ নহে অথবা যে দিব্য মানব পরমপুরুষের ইচ্ছার যন্ত্র হইবে, পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ শক্তি এবং বিগ্রহ হইবে, তাহার কর্ম্মের দিব্যভাব লাভেরও ইহা পথ নহে।

গীতা প্রথম হইতেই নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, দিব্যজন্ম, উর্দ্ধের জীবন লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োজন রাজসিক বাসনাকে এবং

ইহা হইতে উদ্ভূত অন্যান্য রিপুগণকে বধ করিতেই হইবে; এবং ইহার অর্থ, পাপকে বর্জ্জন করিতে হইবে*। আত্মা কর্ত্তৃক প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার আত্মসংযম ও আত্মজয়ের উচ্চ চেষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া নীচের প্রকৃতি যে নিজের অজ্ঞান, মূঢ় বা দুর্দ্ধর্ষ রাজসিক ও তামসিক ভাবের অশুদ্ধ ভোগের জন্য কর্ম্ম করে তাহাই পাপ। নীচের প্রকৃতি যে এইভাবে নীচ রাজসিক ও তামসিক ভাবের দ্বারা মানুষকে অশুদ্ধ ভোগের দিকে জোর করিয়া টানিয়া লয়, ইহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রকৃতির সর্ব্বোচ্চ ভাব, সত্ত্বগুণের আশ্রয় লইতে হইবে। এই সাত্ত্বিক ভাব সকল সময়েই জ্ঞানের আলোক এবং কর্ম্মের সত্য নীতির সন্ধান করে। আমাদের মধ্যে যে পুরুষ রহিয়াছে, যে আত্মা প্রকৃতির গুণসমূহের বিভিন্ন প্রেরণায় সায় দিতেছে, তাহাকে সাত্ত্বিক প্রেরণায় অনুমতি দিতে হইবে। আমাদিগকে সাত্ত্বিক প্রেরণার বশে চলিতে হইবে, রাজসিক বা তামসিক প্রেরণার বশে নহে। কর্ম্মে সকল উচ্চ যৌক্তিকতার এবং সকল প্রকৃত নৈতিকতার ইহাই অর্থ। আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যে নিয়ম প্রকৃতির নীচ বিশৃঙ্খল কর্ম্ম হইতে তাহার উপরের সুশৃঙ্খল কর্ম্মের বিকাশ করিতে চাহিতেছে ইহা তাহাই। রিপুর বশে, অজ্ঞানের বশে, কর্ম্ম করিলে শোক, দুঃখ, অশান্তিতে পড়িতে হয়। তাহা না করিয়া ইহা জ্ঞানের বশে এবং প্রবুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির বশে কর্ম্ম

* কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩।৩৭
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১

করিয়া অভ্যন্তরীণ সুখ, স্থিরতা ও শান্তি লাভ করিতে চাহিতেছে। আমরা গুণত্রয়ের উপরে উঠিতে পারি না, যদি আমরা আমাদের মধ্যে প্রথমে শ্রেষ্ঠ গুণ সত্ত্বের ধর্ম্ম বিকাশ না করি।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥৭।১৫

"মূঢ়, নরাধম, পাপীগণ আমাকে লাভ করিতে পারে না; কারণ মায়া তাহাদের জ্ঞানকে হরণ করিয়া লয় এবং তাহারা আসুরভাব প্রাপ্ত হয়।" প্রকৃতিতে অবস্থিত আত্মা "আমি"র ছলনায় মুগ্ধ হইয়াই এইরূপ বিমূঢ় হইয়া পড়ে। পাপী ভগবানকে পায় না; কারণ, সে মানবীয় প্রকৃতির নিম্নতম স্তরে পড়িয়া থাকিয়া সর্ব্বদা "আমি" দেবতার তৃপ্তির জন্যই ব্যস্ত থাকে। প্রকৃত পক্ষে এই "আমি"ই তাহার ভগবান। তাহার মন ও বুদ্ধি ত্রিগুণের মায়ার দ্বারা অপহৃত হওয়ায় আত্মার যন্ত্র না হইয়া স্বেচ্ছায় তাহার বাসনার দাস হয়; অথবা আত্ম প্রতারণার বশে তাহার বাসনা-তৃপ্তির যন্ত্র হয়। সে দেখে কেবল তাহার এই নীচের প্রকৃতিকে, কিন্তু তাহার উচ্চতম আত্মা বা শ্রেষ্ঠ সত্তাকে সে দেখিতে পায় না, তাহার মধ্যে এবং সংসারের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহাকেও দেখিতে পায় না। তাহার "আমি"কে এবং বাসনাকে কেন্দ্র করিয়াই সে সংসারকে বুঝিয়া থাকে; এবং কেবল এই অহঙ্কার ও বাসনারই সেবা করে। ঊর্দ্ধের প্রকৃতি এবং উচ্চতর জীবনধারা লাভের কোনও আকাঙ্খা না রাখিয়া অহঙ্কার ও বাসনার সেবা করে,—ইহাই অসুরের মন, অসুরের ভাব। উপরের দিকে উঠিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই চাই উপরের প্রকৃতিতে উঠিবার, ঊর্দ্ধের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাঙ্খা আস্পৃহা (aspiration), চাই বাসনা অপেক্ষা আরও কোন শ্রেষ্ঠ নীতির অনুসরণ করা;—"আমি"র

পূজা না করিয়া, "আমি"কেই বড় করিয়া দেবতার আসনে না বসাইয়া চাই কোনও মহত্তর দেবতাকে জানা ও পূজা করা, চাই সত্য চিন্তা করা, সত্য কর্ম্মের কর্ম্মী হওয়া। তবে শুধু ইহাই যথেষ্ট নহে; কারণ, সাত্ত্বিক মানুষও ত্রিগুণের খেলায় মুগ্ধ হয়; যেহেতু সে তখনও ইচ্ছা ও দ্বেষের অধীন। সে প্রকৃতির নামরূপের চতুঃসীমার মধ্যেই ঘুরিতেছে, এখনও সে উচ্চতম জ্ঞানলাভ করিতে পারে নাই, প্রপ্রঞ্চাতীত (transcendental) ও অখণ্ড জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি সর্ব্বদা সত্যচিন্তা ও সত্যকর্ম্ম করিবার উচ্চাকাঙ্খার ফলে অবশেষে সে পাপের মোহ হইতে অর্থাৎ রাজসিক বাসনা ও রিপুর মোহ হইতে মুক্ত হয় এবং বিশুদ্ধ প্রকৃতি লাভ করে। তখন ত্রিগুণময়ী মায়ার আধিপত্য ছাড়াইয়া উঠা তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। কেবল পুণ্যের দ্বারাই মানুষ শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিতে পারে না; কিন্তু পুণ্যের* দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতির প্রথম যোগ্যতা বা অধিকার লাভ করা যায়। কারণ, অসংস্কৃত রাজসিক "আমি"কে অথবা জড়ভাবাপন্ন তামসিক "আমি"কে বর্জ্জন করা বা ছাড়াইয়া উঠা কঠিন। সাত্ত্বিক "আমি" তত কঠিন নহে; এবং অবশেষে যখন ইহা নিজেকে যথেষ্ট শুদ্ধ ও বুদ্ধ করিয়া তোলে, তখন ইহাকে অতিক্রম করা, রূপান্তরিত করা বা ধ্বংস করা সহজেই সম্ভব হয়।

অতএব মানুষকে সর্ব্বপ্রথমে নীতিপরায়ণ, সুকৃতি (ethical) হইতে হইবে, এবং তাহার পর কেবলমাত্র নীতিপরায়ণতার মধ্যেই আবদ্ধ না থাকিয়া, তাহার উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, অধ্যাত্ম প্রকৃতির

* অবশ্য এখানে পুণ্য বলিতে গতানুগতিক ভাবে সামাজিক বা লৌকিক বিধিনিষেধের অনুসরণ বুঝাইতেছে না, ভিতরের সত্যিকারের যে পুণ্য, চিন্তা ভাব উদ্দেশ্য কর্ম্মের যে সাত্ত্বিক পবিত্রতা, তাহার দ্বারাই মানুষ উর্দ্ধগতির প্রথম অধিকার লাভ করে।

আলোক, প্রসারতা ও শক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। সেখানে সে দ্বন্দ্বমোহের অতীত হইবে। সেখানে আর সে তাহার ব্যক্তিগত কল্যাণ বা সুখ খুঁজিবে না, অথবা ব্যক্তিগত দুঃখ ও যন্ত্রনা এড়াইতে চাহিবে না, কারণ, এই সকলের দ্বারা তখন আর সে বিচলিত হইবে না, তখন আর সে বলিবে না, "আমি পুণ্যবান," "আমি পাপী' কিন্তু, নিজের উচ্চ অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিশ্বকল্যাণের জন্য কার্য্য করিবে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, এই অবস্থায় পৌছিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমেই প্রয়োজন—আত্মজ্ঞান, সমতা ও নির্ব্যক্তিক ভাব (impersonality), জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, আধ্যাত্মিকতার সহিত সাংসারিক কাজের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, কালাতীত আত্মার অচল নিষ্ক্রিয়তার সহিত প্রকৃতির ক্রিয়াশীলা শক্তির অনন্ত লীলার সামঞ্জস্য করিতে হইলে উহাই পথ। কিন্তু, যে কর্ম্মযোগী এইভাবে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সমন্বয় করিয়াছে, গীতা এইবার তাহার পক্ষে আর একটি আরও মহান্ প্রয়োজনের কথা বলিতেছে। এখন তাহার কাছে কেবল জ্ঞান ও কর্ম্মই চাওয়া হয় নাই, ভক্তিও চাওয়া হইতেছে। চাই ভগবদ্ভক্তি, ভগবদ্প্রেম, ভগবদুপাসনা, চাই পুরুষোত্তমকে লাভ করিবার জন্য আত্মার আকাঙ্ক্ষা। এ পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে এই প্রয়োজনের কথা না হইলেও ইহার জন্য শিষ্যকে ইতিপূর্ব্বেই প্রস্তুত করা হইয়াছে যখন গুরু বলিয়াছেন যে, তাঁহার যোগে সকল কর্ম্মকে ক্রমশঃ আমাদের জীবনের ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে পরিণত করিতেই হইবে,—সকল, কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াই এই যোগ পূর্ণ হইবে। শুধু আমাদের নির্ব্যক্তিক আত্মায় (impersonal self) সমর্পণ নহে, নির্ব্যক্তিক ভাবের ভিতর দিয়া সেই ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে যাঁহা হইতে

আমাদের সকল ইচ্ছা, সকল শক্তির উৎপত্তি। সেখানে যাহা ইঙ্গিত করা হইয়াছে এখন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে; এবং এখন আমরা গীতার উদ্দেশ্যটি আরও পূর্ণভাবে দেখিতে আরম্ভ করিতেছি।

এখন আমাদের সম্মুখে তিনটি পরস্পর-সাপেক্ষ প্রক্রিয়া ধরা হইয়াছে, যাহাদের দ্বারা আমরা সাধারণ প্রাকৃত জীবন হইতে মুক্ত হইতে পারি এবং দিব্য অধ্যাত্মজীবনে গড়িয়া উঠিতে পারি।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ৭।২৭

"ইচ্ছা দ্বেষ হইতে যে সকল দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হয় তাহাদের মোহে সংসারের সকলেই ভ্রমে পতিত হয়।" সেই অজ্ঞান, সেই অহঙ্কার সর্ব্বত্র ভগবানকে দেখিতে পায় না, ধরিতে পারে না; কারণ উহা শুধু প্রকৃতির দ্বন্দ্বসমূহকেই দেখিয়া থাকে এবং সর্ব্বদা নিজের স্বতন্ত্র সত্তা এবং বাসনা ও বিরাগসমূহকে লইয়াই ব্যস্ত থাকে। এই চক্র হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে আমাদের কর্ম্মে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন হইতেছে রাজসিক "আমি"র পাপ হইতে মুক্তি হওয়া, রিপুর জ্বালা হইতে, রাজসিক প্রকৃতির বাসনার উপদ্রব হইতে মুক্ত হওয়া, এবং আমাদের নৈতিক জীবনের সাত্ত্বিক প্রেরণা ও সংযমের দ্বারাই ইহা সম্পাদন করিতে হইবে। যখন উহা সম্পন্ন হইবে,—যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্,—অথবা যখন উহা সম্পন্ন করা হইতেছে, কারণ, কতক দূর অগ্রসর হইবার পরই সাত্ত্বিক প্রকৃতির যতই বিকাশ হইবে ততই এক উচ্চস্তরের শান্তি, সমতা ও মুক্তভাব লাভের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে —তখন প্রয়োজন হইবে দ্বন্দ্বসকলের উপরে উঠা এবং নির্ব্যক্তিক ভাব ও সমতা লাভ করা, অক্ষরের সহিত একাত্মভাব, সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মভাব লাভ করা। অধ্যাত্মভাবের এইরূপ বিকাশই আমাদের

শুদ্ধিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবে। কিন্তু যখন ইহা করা হইতেছে, জীব যখন আত্মজ্ঞানে বর্দ্ধিত হইতেছে, তখন তাহাকে ভক্তিতেও বর্দ্ধিত হইতে হইবে। কারণ, জীবকে যে সমতার এক উদার ভাব লইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে শুধু তাহাই নহে,—ঈশ্বরার্থ যজ্ঞও করিতে হইবে। ঈশ্বর সর্ব্বভূতের মধ্যে অবস্থিত, তাঁহাকে এখনও সে সম্পূর্ণ ভাবে জানে না; কিন্তু তাঁহাকে এইভাবে সে জানিতে পরিবে,—সমগ্রম্ মাম্,—যখন সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বভূতে এক আত্মাকে দর্শন করার স্থির দৃষ্টি সে লাভ করিবে। সমতা এবং একত্বদর্শন যখন পূর্ণরূপে লাভ হইয়াছে —তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ—তখন উত্তমা ভক্তি, ভগবানের প্রতি সর্ব্বতোমুখী ভক্তি হইবে জীবনের সমগ্র ও একমাত্র নীতি। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অন্য সকল নীতি সেই আত্মসমর্পণের মধ্যেই নিমজ্জিত হইবে,—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। জীব তখন এই ভক্তিতে সুদৃঢ় হইবে, তাহার সকল জীবন, জ্ঞান ও কর্ম্ম আত্ম-নিবেদন করিবার সঙ্কল্পে সে সুদৃঢ় হইবে; কারণ তখন সে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান সম্বন্ধে পূর্ণ, সমগ্র, ঐক্য-সাধক জ্ঞানেই নিজের নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা পাইবে, জীবনের ও কর্ম্মের চরম ভিত্তি পাইবে,—তে ভজন্তে মাম্ দৃঢ়ব্রতাঃ।

সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে, জ্ঞান ও নির্ব্যক্তিক ভাব লাভ করিবার পর আবার ভক্তির দিকে ফিরিয়া আসা অথবা হৃদয়বৃত্তির ক্রিয়া চলিতে দেওয়া, ইহা পশ্চাৎগমন বলিয়াই মনে হইতে পারে। কারণ, ভক্তিতে সকল সময়েই ব্যক্তিত্বের ভাব, এমন কি, ব্যক্তিত্বের ভিত্তি রহিয়াছে। কারণ ভক্তির মূল প্রেরণা হইতেছে জগদীশ্বরের প্রতি ব্যষ্টিগত আত্মা বা জীবের প্রেম ও শ্রদ্ধা। কিন্তু, গীতার দিক হইতে দেখিলে এইরূপ আপত্তি আদৌ উঠিতে পারে না; কারণ, নামরূপের অতীত অনন্ত নির্ব্যক্তিক সত্তার (The eternal imper-

sonal) মধ্যে লয় হওয়া, নিষ্ক্রিয় হওয়া, গীতার লক্ষ্য নহে,—আমাদের সমগ্র জীবনের ভিতর দিয়া পুরুষোত্তমের সহিত মিলিত হওয়াই গীতার লক্ষ্য। সত্য বটে, এই যোগে জীব নিজের নির্ব্যক্তিক ও অক্ষর আত্মসত্তাকে উপলব্ধি করিয়া নীচের ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হয়; কিন্তু তখনও সে কর্ম্ম করে, এবং প্রকৃতির ক্ষরলীলায় রত বহুধা-আত্মাই সকল কর্ম্মের অধিপতি। নিরতিশয় নিষ্ক্রিয়তাকে সংশোধন করিবার জন্য আমরা যদি ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞের আদর্শ না আনি, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে এই যে কর্ম্ম চলিতে থাকে, সেইটাকে দেখিতে হয় যেন আদৌ আমাদের নয়, সেটা যেন ত্রিগুণের খেলারই কিছু অবশিষ্টাংশ, তাহার পশ্চাতে দিব্য সত্য কিছুই নাই। আমাদের যে অহং, যে আমিত্ব লয়প্রাপ্ত হইতেছে, তাহারই একটা রূপ, নীচের প্রকৃতির খেলারই জের। তাহার জন্য আমরা দায়ী নহি, কারণ, আমাদের জ্ঞান তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাহা হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ নিষ্ক্রিয় অবস্থা লাভ করিতে চায়। কিন্তু অদ্বিতীয় আত্মার শান্ত নির্ব্যক্তিক ভাবের সহিত ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞার্থে কৃত প্রকৃতির কর্ম্মলীলা যোগ করিয়া দিয়া, আমরা এই দ্বিবিধ সাধনার দ্বারা নীচের অহংভাবপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারি এবং আমাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক স্বরূপের পবিত্রতায় গড়িয়া উঠিতে পারি। তখন আর আমরা নীচের প্রকৃতির বদ্ধ অজ্ঞান "আমি" থাকি না; তখন দিব্য পরা প্রকৃতিতে মুক্ত জীব হই। তখন আর আমরা এই জ্ঞানের মধ্যে থাকি না যে, এক অক্ষর ও নির্ব্যক্তিক আত্মা এবং এই ক্ষর বহুধা প্রকৃতি, এই দুইটি পরস্পর বিরোধী সত্তা; কিন্তু আমাদের জীবনের এই দুইটি দিক দিয়া একসঙ্গে উঠিয়া পুরুষোত্তমের আলিঙ্গনের মধ্যেই বাস করি। এই তিনই আধ্যাত্মিক সত্তা। তৃতীয় সত্তাটিই উচ্চতম;

এবং যে দুইটিকে পরস্পরের বিরোধী দেখায়, তাহারা ঐ তৃতীয় সত্তারই দুইটি সাম্‌না-সাম্‌নি দিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৃষ্ণ পরে বলিবেন— *

"আধ্যাত্মিক পুরুষ দুইটি—নামরূপের অতীত নির্ব্যক্তিক (impersonal) অক্ষর পুরুষ এবং নামরূপযুক্ত (personal) ক্ষর পুরুষ। কিন্তু, আরও একটি উত্তমপুরুষ আছেন, তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয়। তিনি সমস্ত জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে ধরিয়া আছেন। তিনি ঈশ্বর অব্যয়। আমিই এই পুরুষোত্তম, আমি ক্ষরের উপর, এমন কি আমি অক্ষর অপেক্ষাও বড়, অক্ষরেরও উপরে। যে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে সকল জ্ঞানের সহিত সর্ব্বভাবে, তাহার প্রাকৃত জীবনের সকল দিক দিয়া আমাকে ভজনা করে।" এই যে সম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত এবং সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের সহিত ভক্তি, গীতা এখন তাহাই পরিস্ফুট করিতে আরম্ভ করিতেছে।

কারণ, মনে রাখিতে হইবে যে, গীতা শিষ্যের নিকট জ্ঞানযুক্ত ভক্তিই চাহিয়াছে; এবং অন্যান্য প্রকারের ভক্তি আপন আপন ভাবে

---

* দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্ব্বানি ভূতানি কুটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি, পুরুষোত্তমম্,।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥ ১৫।১৬—১৯

ভাল হইলেও, গীতা বলিয়াছে যে, সে সব নিম্নস্তরের ভক্তি; সাধন-মার্গে তাহারা কল্যাণকর হইতে পারে বটে, কিন্তু আত্মার যে চরম সিদ্ধি গীতার লক্ষ্য, ঐসব ভক্তি সে জিনিষ নহে। যে-সকল ব্যক্তি রাজসিক আমিত্বের পাপ বর্জ্জন করিয়াছে এবং ভগবানের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গীতা চারি শ্রেণীর ভক্তকে পৃথক করিয়াছে।* কেহ সংসারের দুঃখ-কষ্ট হইতে আশ্রয়ের জন্য তাঁহার দিকে যায়—আর্ত্ত। কেহ ঐহিক কল্যাণদাতা বলিয়া তাঁহার উপসনা করে,—অর্থার্থী। কেহ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার নিকটে আসে—জিজ্ঞাসু। আবার কেহ জ্ঞানের সহিত তাঁহাকে ভজনা করে,—জ্ঞানী। গীতা সকলকেই প্রশংসা করিয়াছে, কিন্তু কেবল শেষেরটিকেই সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করিয়াছে। এই সকল চেষ্টার কোনটাই মন্দ নহে, সবগুলিই উদার ও কল্যাণকর—উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে,—কিন্তু জ্ঞানের সহিত যে ভক্তি তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—বিশিষ্যতে। এই যে কয়েক প্রকারের ভক্তি ইহাদিগকে ক্রমান্বয়ে বলিতে পারা যায়, ভাবপ্রবণ প্রকৃতির ভক্তি (আর্ত্ত), কর্ম্মপ্রবণ প্রকৃতির ভক্তি (অর্থার্থী), চিন্তাপ্রবণ প্রকৃতির ভক্তি (জিজ্ঞাসু), এবং সর্ব্বোচ্চ অন্তর্জ্ঞানময় সত্তার (the highest intuitive being) ভক্তি (জ্ঞানী)। এই সত্তাই প্রকৃতির অন্যান্য অংশকে লইয়া ভগবানের সহিত একত্ব সাধন করে। যাহাই হউক, কার্য্যতঃ অন্যান্য প্রকারের ভক্তিকে প্রাথমিক সাধনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ, গীতা নিজেই এখানে বলিয়াছে যে, বহু জন্ম পরে

---

* চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৭।১৬

সমগ্র জ্ঞান লাভ করিয়া এবং সেই জ্ঞান অনুসারে জীবনকে গঠন করিয়া তবে মানুষ অবশেষে বিশ্বাতীত ভগবানকে লাভ করিতে পারে। কারণ, যাহা কিছু আছে সে সবই ভগবান, এই জ্ঞান-লাভ করা অতিশয় কঠিন; এবং যিনি এইরূপ সমগ্র ভাবে ভগবানকে দেখিতে পারেন, এবং নিজের সমগ্র সত্তা লইয়া, প্রকৃতির সর্ব্বভাব লইয়া ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন,—সর্ব্ববিৎ সর্ব্বভাবেন,—সেরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ। *

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কেবল ঐহিক লাভের জন্যই যে-ভক্তি ভগবানের উপাসনা করে, অথবা সংসারের দুঃখ, যন্ত্রণা এড়াইবার জন্যই ভগবানের শরণাপন্ন হয়, কেবল ভগবানকে পাইবার জন্যই ভগবানের উপাসনা করে না, সে ভক্তি কেমন করিয়া উদার ও মহৎ হইল,—উদারাঃ? এইরূপ ভক্তিতে কি অহঙ্কার, দুর্ব্বলতা ও বাসনারই প্রাধান্য নহে এবং ইহা কি নীচের প্রকৃতিরই খেলা নহে? আরও কথা এই যে, যেখানে জ্ঞান নাই সেখানে ভক্ত ভগবানকে সমগ্রভাবে সর্ব্বতোভাবে জানিয়া,—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি,—ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় না; কিন্তু অসম্পূর্ণ নামরূপের ভিতর দিয়া ভগবানের কল্পনা করে, সে সব তাহার নিজেরই প্রয়োজন স্বভাব ও প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং সেই সব নামরূপের পূজা করিয়া সে নিজের প্রাকৃত বাসনার তৃপ্তি করিতে চায়। ভগবানকে কেহ ইন্দ্র বা অগ্নিরূপে, বিষ্ণু বা শিবরূপে, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধরূপে কল্পনা করে; কেহ ভগবানকে কতকগুলি

* বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। ৭।১৯

প্রাকৃত গুণরাশির সমষ্টি বলিয়া কল্পনা করে,—তিনি প্রেমময়, ক্ষমাশীল ; কেহ বা আবার ভাবে ভগবান অতি কঠোর ন্যায়পরায়ণ, বিচারপরায়ণ ; কেহ ভগবানকে ক্রোধপরায়ণ, ভীষণ দণ্ডদাতা ভাবিয়া ভয়মিশ্রিত ভক্তির সহিত দেখিয়া থাকে, আবার কেহ এই সব লক্ষণ কোন রকমে মিলাইয়া মিশাইয়া ভগবানের কল্পনা করে, অন্তরে এবং বাহিরে সেই ভগবানের বেদী স্থাপন করে এবং তাঁহার সম্মুখে লুণ্ঠিত হইয়া পার্থিব কল্যাণ ও সুখ প্রার্থনা করে, অথবা শোক-দুঃখে সান্ত্বনা প্রার্থনা করে, অথবা নিজেদের ভ্রান্ত, গোঁড়ামিপূর্ণ পরমত—অসহিষ্ণু সাম্প্রদায়িক জ্ঞানের সমর্থন প্রার্থনা করে। এই সবই কতক দূর পর্য্যন্ত খুবই সত্য। যাহা কিছু আছে সে সবই সর্ব্বব্যাপী বাসুদেব, এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা অতি দুর্ল্লভ,—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ। বিবিধ বাহ্য বাসনার দ্বারা চালিত হইয়া মনুষ্য-সকল বিপথগামী হয়। ঐ সকল বাসনা তাহাদের ভিতরের জ্ঞান-ক্রিয়াকে হরণ করিয়া লয়—কামৈ স্তৈ স্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ। অজ্ঞান তাহারা, অপর দেবতার আরাধনা করে, তাহারা ভগবানের সেই সব অসম্পূর্ণ রূপের পূজা করে যাহা তাহাদের বাসনার অনুরূপ হয়,—প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ। তাহারা নিজেরা ক্ষুদ্র, তাই এমন সব সঙ্কীর্ণ নিয়ম বা মতবাদ স্থাপন করে, যাহা হইতে তাহাদের প্রকৃতির প্রয়োজন সিদ্ধ হয়,—তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া। এবং এই সবেতেই তাহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত প্রেরণার দ্বারাই বাধ্য হয়,—তাহারা নিজেদের প্রকৃতিরই এই সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনকে অনুসরণ করিয়া চলে এবং সেইটিকেই পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করে,—অনন্তকে তাহার বিশালতার সহিত গ্রহণ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। তাহাদের

শ্রদ্ধা যদি পূর্ণ থাকে তাহা হইলে ভগবান এই সকল বিভিন্ন নামরূপের ভিতর দিয়াই তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। কিন্তু এই সব ফল ও ভোগ ক্ষণস্থায়ী। যাদের মন ক্ষুদ্র, বুদ্ধি এখনও বিকশিত হয় নাই, কেবল তাহারাই এই সকলের অনুসরণকে ধর্ম্মের ও জীবনের নীতি বলিয়া গ্রহণ করে। এই পথে আধ্যাত্মিক লাভ যদি কিছু হয়, তাহা কেবল দেবতাদের নিকট পর্য্যন্তই পৌছান; ক্ষর প্রকৃতির লীলার মধ্যে ভগবান যে বিভিন্ন নামরূপ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার ফল প্রদান করিতেছেন, তাহারা ভগবানকে কেবল প্রকৃতির সেই সব নামরূপের মধ্যে লাভ করে। কিন্তু যাহারা প্রকৃতির অতীত ভগবানকে সমগ্র সত্তায় উপাসনা করে তাহারা এই সবকেই পায়, এবং এই সবেরই রূপান্তর সাধন করে,—দেবতাগণকে তাহাদের উচ্চতম স্তরে, প্রকৃতিকে তাহার উচ্চতম শিখরে উত্তোলন করে; এবং তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া একেবারে ভগবানের নিকটেই পৌছায়, বিশ্বাতীত পরম বস্তুকে লাভ করে—দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।

তথাপি পরমেশ্বর ভগবান এই সকল ভক্তকে তাহাদের অসম্পূর্ণ দৃষ্টির জন্য পরিত্যাগ করেন না; কারণ, ভগবানের এই সকল আংশিক প্রকাশের অতীত যে অজ, অব্যয়, শ্রেষ্ঠ ভাব, কোনও জীবের পক্ষেই ভগবানকে সেই ভাবে জ্ঞাত হওয়া সহজ নহে। —মায়ার * বিরাট আচ্ছাদনে তিনি নিজেকে সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যে জগতের সহিত এক হইয়াও জগতের অতীত, সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকিয়াও

---

* নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ৭।২৫

অগোচর, সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও সকলেরই নিকট প্রকাশিত নহেন, ইহা তাঁহারই যোগমায়ার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। প্রকৃতিতে বদ্ধ মানুষ মনে করে যে, প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের যে-সব প্রকাশ তাহাই ভগবানের সব; কিন্তু বস্তুতঃ সে-সব কেবল তাঁহার ক্রিয়া, তাঁহার শক্তি, তাঁহার অবগুণ্ঠন। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সবই সমগ্রভাবে জানেন; কিন্তু তাঁহাকে এখনও কেহ জানিতে পারে নাই *। তাহা হইলে ভগবান প্রকৃতিতে নিজের লীলার দ্বারা তাহাদিগকে এইভাবে বিমূঢ় করিবার পর যদি তাহাদিগকে এই সবের ভিতর দিয়াই দেখা না দেন তাহা হইলে কোনও মানুষের পক্ষে, মায়ায় বদ্ধ কেনোও জীবের পক্ষেই ভগবানকে পাওয়ার কোনও আশাই থাকিবে না। অতএব, আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে যে যে-ভাবে ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়, ভগবান তাহাদের ভক্তি গ্রহণ করেন এবং ভগবদ্ প্রেম ও দয়ার দ্বারা তাহার প্রতিদান দেন। এই যে-সব বিভিন্ন দেবতার রূপ, বস্তুতঃ ইহাদের ভিতর দিয়া মানুষের অপূর্ণ বুদ্ধি ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারে; এই যে-সব বাসনার অনুসরণ প্রথমতঃ ইহাদের ভিতর দিয়াই মানুষ ভগবানের দিকে মুখ ফিরায়; কোনও ভক্তি যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন, তাহা একেবারে বৃথা বা নিরর্থক নহে। ইহার মধ্যে অতি বড় প্রয়োজনীয় জিনিষটি রহিয়াছে,—শ্রদ্ধা (faith)। "যে-কোনও ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত আমার যে-কোনও রূপের পূজা করে আমি তাহার সেই শ্রদ্ধা দৃঢ় ও অচল

* বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ ৭।২৬

করিয়া দিই।"‡ তাহার নিজের মতানুযায়ী পূজায় তাহার যে-বিশ্বাস সেই বিশ্বাসের জোরেই সে তাহার বাসনানুযায়ী ফললাভ করে এবং সেই সময়ে যে-আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের সে যোগ্য, সেই সিদ্ধি সে লাভ করে। তাহার সমস্ত কল্যাণ ভগবানের নিকট চাহিতে চাহিতে শেষ পর্যান্ত সে ভগবানকেই তাহার একমাত্র কল্যাণ বলিয়া প্রার্থনা করিবে। তাহার সমস্ত আনন্দের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিতে করিতে সে ভগবানের মধ্যেই তাহার সমস্ত আনন্দের সন্ধান করিতে শিখিবে। ভগবানকে তাঁহার নামরূপ ও গুণের মধ্যে জানিতে জানিতে অবশেষে সে জানিতে পারিবে যে, ভগবানেই সব, তিনি বিশ্বের অতীত এবং সকল বস্তুরই মূল। *

এইভাবে আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্বারা ভক্তি জ্ঞানের সহিত এক হয়। জীব ক্রমশঃ একমাত্র ভগবানেই আনন্দ লাভ করে, সে জানে যে

‡ যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ৭।২১
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ৭।২২

* নীচের তিন প্রকারের যে ভক্তি, সর্ব্বোত্তম সিদ্ধিলাভের পরও তাহাদের একটা স্থান আছে; কিন্তু তখন তাহারা রূপান্তরিত, তখন সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত ভাব আর থাকে না। দুঃখ ও পাপ ও অজ্ঞান দূর হউক, এই প্রাকৃত জগতে সর্ব্বোত্তম কল্যাণ, শক্তি, আনন্দ ও জ্ঞান উত্তরোত্তর বিকশিত হউক, পূর্ণভাবে প্রকটিত হউক, এই বাসনার বেগ তখনও হৃদয়ে থাকিতে পারে।

ভগবানই সকল সত্তা ও চেতনা ও আনন্দ, ভগবানই সকল বস্তু সকল জীব, সকল ঘটনা। সে প্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে জানে, আত্মাতে ভগবানকে জানে, আবার ভগবান যে আত্মা ও প্রকৃতির অতীত তাহাও অবগত হয়। সে সর্ব্বদা ভগবানের সহিত যোগে অবস্থান করে,—নিত্যযুক্তঃ। যে বিশ্বাতীত সত্তার উপরে আর কিছুই নাই, যে-বিশ্বব্যাপী সত্তা ভিন্ন আর কেহ নাই, কিছুই নাই, তাঁহার সহিত চিরন্তন যোগই হয় তাহার সমগ্র জীবন, সমগ্র সত্তা। তাঁহার উপরেই তাহার সকল ভক্তি একান্তভাবে নিবদ্ধ হয়,—কোনও অংশদেবতা, বিধি বা মতবাদের উপরে নহে। এই ঐকান্তিক ভক্তিই হয় তাহার জীবনের সমগ্র নীতি। সে সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত ও বিশ্বাসের উপরে চলিয়া যায়; সকল নৈতিক বিধি-নিষেধের উপরে, ব্যক্তিগত সকল বাসনা-কামনার উপরে চলিয়া যায়। তখন আর তাহার কোনও শোক দুঃখ থাকে না যে উপশম করিতে হইবে; কারণ, সে সকল আনন্দের আধারকে লাভ করিয়াছে। কোনও বাসনার তৃপ্তির জন্য তখন তাহাকে লালায়িত হইতে হয় না, কারণ, যিনি সব, সকলের উপরে, তাঁহাকেই সে লাভ করিয়াছে; যিনি সকল সিদ্ধি প্রদান করেন, সে সেই সর্ব্বশক্তিমানের সামীপ্য লাভ করিয়াছে। তাহার কোন সংশয়, কোন অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা অবশিষ্ট থাকে না, কারণ যে-দিব্য জ্যোতির মধ্যে সে বাস করে, তাহা হইতেই সমস্ত জ্ঞান তাহার উপর বিচ্ছুরিত হয়। ভগবানের প্রতি তাহার পূর্ণ প্রেম এবং সে ভগবানের প্রিয়; কারণ, সে ভগবানে যেরূপ আনন্দ পায়, ভগবানও তাহাতে সেইরূপই আনন্দ পান। *

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।

জ্ঞানের সহিত যে ভগবানের ভজনা করে, যে জ্ঞানী-ভক্ত, ইহাই তাহার স্বরূপ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, এইরূপ জ্ঞানী তাঁহার আত্মা,—জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্। অপর ভক্তেরা কেবল প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন শক্তিকে আশ্রয় করে; কিন্তু জ্ঞানীভক্ত একেবারে পুরুষোত্তমের আত্মসত্তা ও লীলাকে আশ্রয় করে, তাঁহারই সহিত সে যুক্ত। তাহারই হইয়াছে পরা প্রকৃতিতে দিব্য জন্ম, জীবনে সে পূর্ণ-বিকশিত, ইচ্ছাশক্তিতে পূর্ণ, প্রেমে অনন্ত, জ্ঞানে সিদ্ধ। তাহাতেই জীবের বিশ্বলীলা সার্থক হইয়াছে; কারণ, সে নিজেকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে এবং এইভাবেই তাহার জীবনের পূর্ণতম উচ্চতম সত্যকে লাভ করিয়াছে।

পরম পুরুষ (১)

সপ্তম অধ্যায়ে এপর্যান্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের সাধনার নূতন প্রতিষ্ঠাটি খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিবার সন্ধানও মিলিয়াছে। সংক্ষেপতঃ উহা এই, আমাদিগকে অন্তর্মুখী হইয়া এক উচ্চতর চৈতন্যের দিকে, এক পরম সত্তার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের পার্থিব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ ভাবে বাদ দিতে হইবে না; কিন্তু এখন আমরা মূলতঃ বস্তুতঃ যাহা কিছু, সে সবেরই একটা উচ্চতর, একটা অধ্যাত্ম সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে।—কেবল আমাদের মর্ত্যের অপরিপূর্ণতা ছাড়াইয়া দিব্যজীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে; এরূপ হওয়া যে সম্ভব তাহার কারণ, প্রথমতঃ, মানুষের মধ্যে যে ব্যষ্টিগত আত্মা, জীবাত্মা, রহিয়াছে, উহা মূল সনাতন সত্তায় এবং মূল শক্তিতে পরমাত্মা ও ভগবানেরই স্ফুলিঙ্গ, এখানে উহা ভগবানেরই প্রচ্ছন্ন আবির্ভাব, তাঁহারই সত্তার সত্তা, তাঁহারই চৈতন্যের চৈতন্য, তাঁহারই প্রকৃতির প্রকৃতি, কিন্তু এই দেহ মনের অজ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ, নিজের প্রকৃত সত্তা ও সত্য স্বরূপ সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত। দ্বিতীয়তঃ, জীবাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে দুই প্রকৃতিকে ধরিয়া। মূল প্রকৃতিতে উহা উহার প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্তার সহিতই এক থাকে, এবং নীচের প্রকৃতিতে উহা অহঙ্কার ও অজ্ঞানের বশে মোহগ্রস্ত হয়। এই শেষেরটিকে বর্জন করিতে হইবে; এবং অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে পুনরায় অন্তরের মধ্যে পাইতে

(১) গীতা সপ্তম অধ্যায় ২৯, ৩০ ; অষ্টম অধ্যায়।

হইবে, তাহার পূর্ণ বিকাশ করিতে হইবে, তাহাকে সচল ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। আত্মার অভ্যন্তরীণ বিকাশ সাধন করিয়া, এক নূতন জীবনের দ্বার উন্মোচন করিয়া, এক নূতন শক্তির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাই; এবং আমরা যে-ভগবান হইতে এই মর্ত্ত্য রূপের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছি পুনরায় তাঁহারই অংশ হই।

এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গীতা ভারতের তৎকালীন সমসাময়িক মতকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এখানে জীবনকে অস্বীকার করিবার ভাব, 'নেতি নেতি'র ভাব কম, স্বীকার করার ভাবই বেশী। প্রকৃতির আত্মবিনাশের (a self-annulment of Nature) উপরেই ছিল সেই যুগের একান্ত ঝোঁক; তাহার পরিবর্ত্তে আমারা এক পূর্ণতর সমাধানের ইঙ্গিত পাইতেছি। পরবর্ত্তীকালে যে-সব ভক্তিমূলক ধর্ম্মের বিকাশ হয়,—তাহাদেরও অন্ততঃ একটা পূর্ব্বাভাস এখানে দেখিতে পাইতেছি। আমাদের সাধারণ জীবনের উপরে যে-সত্য রহিয়াছে, আমরা যে-অহংভাবের মধ্যে বাস করি, তাহার পশ্চাতে লুক্কায়িত যে-সত্য, সে-সম্বন্ধে আমাদের যাহা প্রথম অনুভূতি, গীতারও মতে তাহা হইতেছে এক বিশাল, নির্ব্যক্তিক, অক্ষর আত্মার শান্তি, তাহার সমতা ও ঐক্যের মধ্যে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের লোপ করি,—তাহার শান্ত পবিত্রতার মধ্যে আমাদের বাসনা ও রিপুর সমস্ত সঙ্কীর্ণ প্রেরণাকে বর্জ্জন করি। কিন্তু, তাহার পর আমাদের দৃষ্টি যখন আরও পূর্ণ হয়, তখন আমরা দেখিতে পাই এক জীবন্ত অসীম সত্তা, এক দিব্য অপরিমেয় পুরুষ; আমরা যাহা কিছু সবই তাঁহা হইতেই উৎপন্ন, আত্মা ও প্রকৃতি, জগৎ ও জীব, যাহা কিছু আমরা, সবই তাঁহার। আত্মায় যখন

আমরা তাঁহার সহিত এক হই তখন আমরা লয়প্রাপ্ত হই না; বরং এই অনন্তের মহত্ত্বে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়া তাঁহারই মধ্যে আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তাকে ফিরিয়া পাই। ইহা এক সঙ্গেই সাধিত হয় একযোগে তিনটি প্রক্রিয়ার দ্বারা,—তাঁহার ও আমাদের অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মের ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে আত্মার সন্ধান লাভ করা (an integral self-finding); যাঁহার মধ্যে সব রহিয়াছে, যিনিই সব, সেই দিব্য পরম পুরুষের জ্ঞানের ভিতর দিয়া সমগ্র ভাবে আত্মস্বরূপে গড়িয়া উঠা (an integral self-becoming); এবং এই সর্ব্বময়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের প্রতি প্রেম ও ঐকান্তিক ভক্তির ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে আত্ম সমর্পণ করা (an integral self-giving), আমাদের সকল কর্ম্মের প্রভু, আমাদের হৃদয়ের অধিবাসী, আমাদের সমগ্র জাগ্রত জীবনের আধার এই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। তৃতীয়টিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং চরম-সিদ্ধিপ্রদ প্রক্রিয়া। যিনি আমাদের সবের মূল তাঁহাকেই আমাদের সব সমর্পণ করি। আমাদের অবিরত আত্মসমর্পণের দ্বারা আমাদের সকল জ্ঞান তাঁহারই জ্ঞানে পরিণত হয়, আমাদের সকল কর্ম্ম তাঁহারই শক্তির জ্যোতিতে পরিণত হয়। আমাদের আত্ম-সমর্পণে যে প্রেমের আবেগ তাহাই আমাদিগকে তাঁহার নিকটে পৌঁছাইয়া দেয় এবং তাঁহার স্বরূপের গভীরতম রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়।—এই যে ত্রিধা সাধনা, উত্তম রহস্যের দ্বার খুলিবার ত্রিধা শক্তি, প্রেমের দ্বারাই তাহা সম্পূর্ণ হয়, প্রেমের দ্বারাই তাহা পূর্ণতম সিদ্ধিলাভ করে।

আমাদের আত্মসমর্পণ কার্য্যকরী হইতে হইলে প্রথমেই চাই যেন উহাতে পূর্ণ জ্ঞান থাকে। অতএব সর্ব্ব প্রথমেই এই পুরুষকে

জানিতে হইবে তাঁহার দিব্য সত্তার সকল শক্তিতে ও সকল তত্ত্বে, তত্ত্বতঃ, সনাতন মূল স্বরূপে এবং জীবনলীলায়, সকলের পূর্ণ সামঞ্জস্যে। কিন্তু প্রাচীনদের নিকট এই জ্ঞানের, তত্ত্বজ্ঞানেব, মূল্য কেবল এই ছিল যে, ইহার শক্তিতে আমরা মরজীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এক পরম জীবনের অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি। কিন্তু এই মুক্তিও উচ্চতমভাবে কিরূপে গীতার নিজস্ব অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারাই পরিণামে লাভ করা যায়, গীতা এখন তাহাই দেখাইতেছে। গীতার কথার মর্ম্ম এই যে, পুরুষোত্তমের জ্ঞানই ব্রহ্ম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যাহারা আমাকে তাহাদের আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করে,—শরণমাশ্রিত্য, তাহাদের দিব্য জ্যোতিঃ, তাহাদের মুক্তিদাতা, তাহাদের আত্মার গৃহীতা ও আশ্রয়দাতা বলিয়া ভজনা করে,—যাহারা জরা ও মরণ হইতে, মরজীবন এবং ইহার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য অধ্যাত্ম সাধনায় আমার শরণাপন্ন হয়, তাহারা "সেই ব্রহ্মকে" জানিতে পারে, সমগ্রভাবে অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে জানিতে পারে এবং অখিল কর্ম্মকে জানিতে পারে (*)। আর যেহেতু তাহারা আমাকে জানে এবং সেই সঙ্গেই অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞকে জানে, সেই জন্য এই দেহের জীবন ছাড়িয়া যাইবার সন্ধিক্ষণেও আমার সম্বন্ধে জ্ঞান তাহাদের থাকে এবং সেই মুহূর্ত্তে তাহাদের সমগ্র চেতনাকে আমার সহিত যুক্ত করিয়া রাখে (‡)। সেই জন্যই তাহারা আমাকে পায়। মরজীবনে

(*) জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ৭।২৯

(‡) সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৭।৩০

আর বদ্ধ না থাকায় উহারা উচ্চতম দিব্য পদ ঠিক তাহাদেরই ন্যায় লাভ করে যাহারা নির্ব্যক্তিক (impersonal) অক্ষর ব্রহ্মে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে লয় করে। এই নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত দিয়াই গীতা সপ্তম অধ্যায় শেষ করিয়াছে।

এখানে আমরা কয়েকটি কথা পাইতেছি, তাহাদের মধ্যেই ভগবানের জগৎলীলায় আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান মূল সত্য-গুলি সংক্ষেপে রহিয়াছে। ভগবানের সৃষ্টিসূত্র ও কার্য্য-প্রণালীর সকল দিকই উহাদের মধ্যে আছে, জীবাত্মাকে পূর্ণ আত্মজ্ঞানে ফিরিয়া যাইতে হইলে যাহা কিছু প্রয়োজন সবই এখানে রহিয়াছে। প্রথমেই আছে, "সেই ব্রহ্ম,"—তদ্ ব্রহ্ম; পরে প্রকৃতিতে আত্মার মূল প্রকাশ,—অধ্যাত্ম; তাহার পর, অধিভূত এবং অধিদৈব যথা-ক্রমে বহির্জগতের ব্যাপার এবং অন্তর্জগতের ব্যাপার; শেষে, অধিযজ্ঞ, ইহাই জাগতিক কর্ম্ম ও যজ্ঞের নিগূঢ় রহস্য। শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহা ফলতঃ এই,—"আমি পুরুষোত্তম (মাং বিদুঃ), আমি এই সকলেরই উপরে, তথাপি এই সকলেরই মধ্য দিয়া এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের সহায়তাতেই আমাকে সন্ধান করিতে হইবে, জানিতে হইবে,—মানুষের চেতনা যে আমাকে ফিরিয়া পাইবার পথ খুঁজিতেছে, তাহার পক্ষে ইহাই একমাত্র পূর্ণ সাধনা।" কিন্তু কেবল এই শব্দগুলি হইতেই ইহাদের অর্থ প্রথমে স্পষ্ট বুঝা যায় না, অন্ততঃ ইহাদের নানারূপ অর্থ করা যাইতে পারে। এই সকল শব্দের দ্বারা ঠিক কি বুঝাইতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে; এবং আদর্শ শিষ্য অর্জ্জুনও তৎক্ষণাৎ তাহাদের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন

—শুধু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিতে গীতা কোথাও বেশীক্ষণ দাঁড়ায় নাই; গীতা কেবল ততটুকুই এমন ভাবে দিয়াছে যেন তাহাদের সত্যটি ধরিতে পারা যায়, এবং সাধক নিজেই অনুভূতি উপলব্ধি লাভ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে পারে। প্রতিভাসিক (the phenomenal) জগতের বিপরীত স্বপ্রতিষ্ঠ (self-existent) সত্তাকে বুঝাইতে উপনিষদ্ একাধিকবার "তদ্ ব্রহ্ম" এই বাক্য ব্যবহার করিয়াছে; মনে হয় এই বাক্যের দ্বারা গীতা আত্মার অক্ষর প্রতিষ্ঠাকে (the immutable self-existence) বুঝিয়াছে, ইহাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ আত্মাভিব্যক্তি এবং ইহারই অপরিবর্ত্তনীয় অনন্ততার উপরে বাকী সব,—যাহা কিছু চলিতেছে, বিকশিত হইতেছে সেই সব—প্রতিষ্ঠিত,—অক্ষরম্ পরম্ *। পরা প্রকৃতিতে জীবের যে আধ্যাত্মিক ভাব ও মূল প্রকাশের ধারা,—স্বভাব, গীতার মতে তাহাই অধ্যাত্ম,—স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।

গীতা বলিয়াছে, সৃষ্টির প্রেরণা ও শক্তিকেই কর্ম্ম বলা হয়, —বিসর্গঃ কর্ম্মসজ্ঞিতঃ। ঐ প্রথম মূল আত্মপ্রকাশ বা স্বভাব হইতে কর্ম্মই বস্তু সকলকে সৃজন করিতেছে, এবং এই স্বভাবের বশেই কার্য্য করিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে, প্রকৃতিতে বিশ্বলীলা প্রকট করিতেছে। ক্ষরলীলার ফলে যাহা কিছুর আবির্ভাব হইতেছে, অধিভূত বলিতে সেই সমস্তই বুঝিতে হইবে,—অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ।

(*) অক্ষরং ব্রহ্মপরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতাভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮।৩
অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৮।৪

প্রকৃতিতে যে-পুরুষ বিরাজ করিতেছেন,—প্রকৃতিস্থ আত্মা,—তিনিই অধিদৈব। তাঁহার মূল সত্তার যে সব ক্ষর ভাব কর্ম্ম প্রকৃতিতে প্রকট করিতেছে, পুরুষের চেতনায় সে সব প্রতিফলিত হইতেছে। অন্তর্যামী পুরুষ সেই সব দেখিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "কর্ম্মের ও যজ্ঞের অধিপতি,—অধিযজ্ঞ,—বলিতে আমাকেই বুঝায়। আমি ভগবান, বিশ্বদেব, পুরুষোত্তম—এখানে এই সব দেহধারীদের মধ্যে আমি গুপ্তভাবে বিরাজ করিতেছি।" অতএব যাহা কিছু আছে,—সর্ব্বমিদং,—সবই এই কয়েকটি শব্দের সূত্রের মধ্যে পড়িয়াছে।

গীতা এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াই জ্ঞানের দ্বারা অন্তিমে যে মুক্তিলাভ করা যায় তাহাই অবিলম্বে বুঝাইতে অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে এইরূপ মুক্তিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অবশ্য পরে গীতা আবার এই কথার আলোচনা করিবে, এ সম্বন্ধে আরও এমন ব্যাখ্যা দিবে কর্ম্মের জন্য এবং অভ্যন্তরীণ উপলব্ধির জন্য যাহা আবশ্যক। ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এই সকল শব্দ বলিতে যাহা কিছু বুঝায় সেই সবের আরও পূর্ণ জ্ঞানের জন্য অপেক্ষা করিতে পারি। কিন্তু আর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, এখানে এবং ইহার আগে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই এই সকল বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ যতটা বুঝা যায়, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ, এখানে বিশ্বলীলার ধারা সম্বন্ধে গীতার মতটি ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ রহিয়াছে ব্রহ্ম,—ইহা উচ্চতম অক্ষর আত্মপ্রতিষ্ঠ (self-existent) সত্তা; দেশ-কাল-নিমিত্তের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির যে খেলা চলিতেছে তাহার পশ্চাতে সর্ব্বভূতই বস্তুতঃ ব্রহ্ম। কারণ, ঐ আত্ম-প্রতিষ্ঠা আছে, বলিয়াই দেশ, কাল, নিমিত্তের থাকা

সম্ভব হইয়াছে। ঐ অপরিবর্ত্তনশীল সর্ব্বব্যাপী অথচ অখণ্ড আধার যদি না থাকিত, তাহা হইলে দেশ, কাল, নিমিত্তের বিভাগ এবং নামরূপের খেলা সম্ভব হইত না। কিন্তু নিজে ঐ অক্ষরব্রহ্ম কিছুই করে না, কোন কিছুর কারণ হয় না, কোন কিছু সঙ্কল্প করে না। ইহা নিরপেক্ষ (impartial), সম, সকলকেই ধরিয়া আছে, কিন্তু কিছু বাছে না, কিছু উৎপাদন করে না। তাহা হইলে উৎপাদন করে কে, সঙ্কল্প করে কে, পরমপুরুষের দিব্য প্রেরণা দেয় কে? কর্ম্মকে যে পরিচালিত করে এবং অনন্ত সত্তা হইতে কালের মধ্যে কার্য্যতঃ বিশ্বলীলাকে প্রকট করে, সে কে? স্বভাবরূপে প্রকৃতি। পরাৎপর, ভগবান, পুরুষোত্তম রহিয়াছেন এবং তাঁহার অনন্ত অক্ষরতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পরা অধ্যাত্ম শক্তির ক্রিয়াকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। ভগবান যে দিব্য সত্তা, চৈতন্য, ইচ্ছা বা শক্তিকে বিস্তার করিতেছেন,—যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ,—তাহাই পরা প্রকৃতি। ভগবান তাঁহার সত্তায় যাহা কিছু আপনা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ধরেন এবং জীবের অধ্যাত্ম প্রকৃতি বা স্বভাবে প্রকট করেন, সে সবেরই মূল শক্তি ও সত্যটি আত্মা ঐ পরাপ্রকৃতিতে আত্মসম্বিতের আলোকেই দেখিতে পায়। প্রত্যেক জীবের অন্তর্নিহিত সত্য এবং মূল অধ্যাত্মতত্ত্ব, যাহা নিজেকে লীলার মধ্যে কার্য্যতঃ প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে, সংসার মধ্যে যে মূল দিব্য প্রকৃতি সকল পরিবর্ত্তন, বিকৃতি, বিপর্য্যয়ের ভিতরেও দিব্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহাই স্বভাব। স্বভাবের মধ্যে যাহা নিহিত আছে সে সব বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিসৃষ্ট হইয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতি যেন তাহা লইয়া পুরুষোত্তমের অন্তর্দৃষ্টির ছায়ায় যথাশক্তি ব্যবহার করে। নিত্য স্বভাবের মধ্য হইতে, প্রত্যেক ভূতের মূল প্রকৃতি

ও অধ্যাত্মসত্তার মধ্য হইতে, প্রকৃতি নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া উহাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে,—নিজের নামরূপের সমস্ত পরিবর্ত্তনের খেলা, দেশ-কাল-নিমিত্তের পরিবর্ত্তনের খেলা প্রকট করিতেছে *।

এই সব অভিব্যক্তি, এবং অবস্থা হইতে অবস্থার পরিবর্ত্তন—ইহাই কর্ম্ম, প্রকৃতির ক্রিয়া। প্রকৃতিই কর্ম্মী, লীলাময়ী। স্বভাব যখন সৃষ্টিক্রিয়ায় নিজেকে বিস্তার করে (বিসর্গ), তাহাই কর্ম্মের প্রথম রূপ। সৃষ্টি দুই প্রকারের,—ভূত ও ভাব। সৃষ্টিতে যে সকল বস্তু আবির্ভূত হইতেছে, তাহারাই ভূত (ভূতকরঃ), এবং ঐ সকল বস্তু অন্তরে ও বাহিরে যে রূপ গ্রহণ করিতেছে তাহাই ভাব (ভাবকরঃ)। কালের মধ্যে নিয়ত এই সকল জিনিষেরই উৎপত্তি হইতেছে (উদ্ভব); কর্ম্মের সৃষ্টিশক্তিই এই উদ্ভবের মূল। প্রকৃতির শক্তিসমূহের পরস্পর সংযোগে এই সব পরিবর্ত্তনশীল লীলা প্রকট হইতেছে (অধিভূত)। ইহাই জগৎ, ইহাই জীবাত্মার চৈতন্যের বিষয়-বস্তু (the object of the soul's consciousness)। এই সমুদায়ের মধ্যে জীবাত্মাই দ্রষ্টা ও ভোক্তাস্বরূপ প্রকৃতিস্থ দেবতা। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের দিব্য শক্তিসমূহ,—জীবাত্মা আপন চৈতন্যময় সত্তার যে সকল শক্তির দ্বারা প্রকৃতির খেলাকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে, তাহাদিগকে লইয়াই অধিদৈব। অতএব এই প্রকৃতিস্থ আত্মাই ক্ষর পুরুষ, ইহাই পরিবর্ত্তনশীল আত্মা, ভগবানের শাশ্বত কর্ম্মলীলা। এই আত্মা

---

* দেশ ও কালের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থার যে বিকাশ হইতেছে তাহাকেই আমরা নিমিত্ত (causality) বলি।

যখন প্রকৃতি হইতে সরিয়া ব্রহ্মে অবস্থিত, তখন ইহাই অক্ষর-পুরুষ, অপরিবর্ত্তনশীল আত্মা, ভগবানের শাশ্বত নিষ্ক্রিয়তা। কিন্তু ক্ষরপুরুষের দেহ ও রূপের মধ্যে দিব্য পরম পুরুষ বাস করেন। মানুষের মধ্যে পুরুষোত্তম রহিয়াছেন, তাঁহাতে অক্ষর সত্তার শান্তি রহিয়াছে। আবার সেই সঙ্গেই তিনি ক্ষরলীলাও উপভোগ করিতেছেন। তিনি যে কেবল বিশ্বের অতীত এক পরম পদে আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে রহিয়াছেন শুধু তাহাই নহে, তিনি এখানেও সর্ব্বভূতের দেহের মধ্যে রহিয়াছেন, প্রকৃতিতে এবং মানুষের হৃদ্দেশে বিরাজ করিতেছেন। এখানে তিনি প্রকৃতির কর্ম্মসমূহকে যজ্ঞরূপে গ্রহণ করিতেছেন এবং মানুষ সজ্ঞানে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে সেই অপেক্ষায় রহিয়াছেন। কিন্তু সকল সময়ে, এমন কি মানুষের অজ্ঞান ও অহঙ্কারের মধ্যেও, তিনি মানুষের স্বভাবের অধীশ্বর এবং তাহার সকল কর্ম্মের প্রভু। তাঁহার অধ্যক্ষতাতেই প্রকৃতি ও কর্ম্মের ক্রিয়া চলে। তাঁহা হইতেই জীবাত্মা প্রকৃতির ক্ষরলীলায় আবির্ভূত হয়; অক্ষর আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া জীবাত্মা আবার তাঁহাতেই ফিরিয়া যায়, ভগবানের পরমপদ লাভ করে,—পরমং ধাম।

জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ প্রকৃতি এবং কর্ম্মের ক্রিয়ার বশে জগৎ হইতে জগতান্তরে গমনাগমন করে। প্রকৃতিস্থ পুরুষ (Purusha in Prakriti), ইহাই তাহার সূত্র; তাহার মধ্যে আত্মা যাহা চিন্তা করে, যাহা ভাবে, যাহা করে সে সর্ব্বদা তাহাই হয়। পূর্ব্বজন্মে সে যাহা ছিল, যাহা করিয়াছে সেই সবের দ্বারাই তাহার বর্ত্তমান জন্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আবার এই জন্মে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে যেরূপ থাকিবে, যাহা ভাবিবে, যাহা

করিবে সেই সবের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবে যে, সে পরলোকে কি হইবে এবং পরজন্মেই বা কি হইবে। জন্ম যদি "হওয়া" (becoming), তাহা হইলে মৃত্যুও "হওয়া," মৃত্যু কোন ক্রমেই ফুরাইয়া যাওয়া নহে। শরীর পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু জীবাত্মা আপনার পথেই চলিতে থাকে (ত্যক্ত্বা কলেবরম্)। অতএব তাহার মহাযাত্রার সন্ধিক্ষণে সে কিরূপ থাকে তাহার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। কারণ যে-রূপ "হওয়া"র উপর তাহার চিত্ত মৃত্যুকালে নিবিষ্ট থাকে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বেও সর্ব্বদা যাহার চিন্তায় পূর্ণ ছিল, তাহাকে সেই রূপই পাইতে হয়। যেহেতু প্রকৃতি কর্ম্মের দ্বারা জীবাত্মার চিন্তা ও শক্তি সকলের বিকাশ করে। বস্তুতঃ উহাই তাহার একমাত্র কাজ। অতএব, মানবাত্মা যদি পুরুষোত্তমের পদ লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে দুইটি জিনিষের প্রয়োজন। দুইটি সর্ত্ত পূর্ণ করিতেই হইবে; তবেই উহা সম্ভব হইতে পারিবে। পার্থিব জীবনে তাহার সমগ্র অন্তর্জীবনকে ঐ আদর্শের দিকে গড়িয়া তোলা চাই; এবং মৃত্যুকালেও তাহার সেই আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে ঐকান্তিক ভাবে ধরিয়া থাকা চাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "যে কেহ অন্তিমকালে আমাকে অনুস্মরণপূর্ব্বক তাহার দেহত্যাগ করিয়া গমন করে, সে আমার ভাব, অর্থাৎ পুরুষোত্তমের ভাব প্রাপ্ত হয়" *। ভগবানের মূল সত্তার সহিত সে মিলিত হয়। তাহাই জীবাত্মার চরম গতি (পরো ভাব)। এইখানেই কর্ম্মের শেষ পরিণতি,—কর্ম্ম এখানে নিজের মধ্যে,

---

* অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৮।৫

আপনার উৎসে ফিরিয়া আসিয়াছে। বিশ্বলীলার মধ্যে আসিয়া জীবাত্মার মূল অধ্যাত্ম প্রকৃতি,—স্বভাব, ঢাকা পড়িয়া যায়, তাহার চৈতন্যের অন্যান্য প্রতিভাসিক ভাবের বিকাশ হয়,—তম্ তম্ ভাবম্। জীবাত্মা যখন এই বিকাশের লীলা অনুসরণ করিয়া তাহার সকল প্রতিভাসিক ভাবের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে, তখন সে তাহার সেই মূল প্রকৃতিতে ফিরিয়া যায়; এবং এইরূপে ফিরিয়া গিয়া তাহার প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্তার—আত্মার, সন্ধান পায় এবং শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে (মদ্ভাবম্)। এক হিসাবে বলিতে পারা যায় যে, সে তখন ভগবান হয়; কারণ, তাহার প্রতিভাসিক প্রকৃতি ও জীবনের চরম রূপান্তর সাধনের দ্বারা সে ভগবানের প্রকৃতির সহিতই মিলিত হয়।

এখানে গীতা মৃত্যুকালীন মনের ভাব ও চিন্তার উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। গীতা কেন এইরূপ জোর দিয়াছে তাহা বুঝা কঠিন হইবে যদি আমরা চৈতন্যের আত্মসৃজনী শক্তি (self-creative power of consciousness) যাহাকে বলা যাইতে পারে সেই শক্তির পরিচয় না লই। চিন্তা আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা, এবং পূর্ণ ও ঐকান্তিক সঙ্কল্পের সহিত যাহার উপর নিবদ্ধ হয়, আমাদের অভ্যন্তরীণ সত্তারও তাহাতে পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা হয়। এই সম্ভাবনা নিশ্চিত শক্তিতে পরিণত হয় যখন আমরা সেই সকল উচ্চতর অধ্যাত্ম এবং আত্মবিকশিত অনুভূতিতে যাই যেগুলি আমাদের সাধারণ মনস্তত্ত্বের ন্যায় বাহ্য জিনিষের অধীন নহে (এই সাধারণ মনস্তত্ত্ব বাহ্যপ্রকৃতির অধীনতা-পাশে বদ্ধ)। সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, যাহাতে আমাদের মনকে নিবদ্ধ করিয়া রাখি এবং সর্ব্বদা যে দিকে উন্মুখ হইয়া থাকি, আমরা নিশ্চিত-

ভাবে ক্রমশঃ তাহাই হইয়া উঠি। অতএব সেখানে চিন্তার কোন চ্যুতি, স্মৃতির কোন ভ্রংশতা হইলেই ঐ পরিবর্ত্তনের ব্যাঘাত হইবে, অথবা ইহার ক্রিয়ার কিছু অধঃপতন হইবে এবং আমরা যাহা ছিলাম আবার সেই দিকেই ফিরিয়া যাইব,—অন্ততঃ যতক্ষণ না মূলতঃ অনিবর্ত্ত্য ভাবে আমরা আমাদের নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি ততক্ষণ এরূপ অধঃপতনের আশঙ্কা আছে। যখন আমরা ঐরূপ প্রতিষ্ঠা ভ করিয়াছি, যখন উহা আমাদের সাধারণ অনুভূতি-উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে, তখন উহার স্মৃতি আপনা হইতেই থাকে; কারণ তখন উহাই হয় আমাদের চৈতন্যের স্বাভাবিক স্বরূপ। এই মরজীবন ছাড়িয়া যাইবার সন্ধিক্ষণে আমাদের মনের ভাব কিরূপ থাকে তাহার প্রয়োজনীয়তা এখন বুঝা গেল। কিন্তু সমস্ত জীবন মনে না করিয়া কেবল মৃত্যুকালে মনে করিলে, অথবা আমাদের সমস্ত জীবন ধরিয়া যথেষ্টভাবে প্রস্তুত না হইলে শুধু মৃত্যুকালীন অনুস্মরণ আমাদিকে এইরূপ উদ্ধার করিতে পারে না। লৌকিক ধর্ম্ম-সকল মুক্তিলাভের যে-সব সহজ পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাদের সহিত গীতার শিক্ষার সাদৃশ্য নাই। মৃত্যুকালে ধর্ম্মযাজক আসিয়া মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে, সারাজীবন পাপে কাটাইয়াও এইভাবে শেষকালে খ্রীষ্টানোচিত পবিত্র মৃত্যু ("Christian death") হইবে, অথবা পবিত্র কাশীধামে বা গঙ্গাতীরে মরিতে পারিলেই মুক্তিলাভের জন্য আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না—এই সব অজ্ঞান কল্পনার সহিত গীতার শিক্ষা কোথাও মেলে না। যে দিব্য অধ্যাত্মভাবের উপর মনকে দৈহিক মৃত্যুর সময়ে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে,—যম্ স্মরন্ ভাবম্ ত্যজতি অন্তে কলেবরম্,—দৈহিক জীবনেও

প্রতি মুহূর্ত্তে আত্মাকে অন্তরে সেই ভাবে গড়িয়া উঠিতে হইবে,—সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ *। শ্রীগুরু বলিলেন—"অতএব সকল সময়ে আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর, কারণ যদি তোমার মন ও বুদ্ধি সকল সময়ে আমাতে নিবদ্ধ রাখিতে পার এবং আমাকে অর্পণ করিতে পার,—ময্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ,—তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি আমাতেই আসিবে। যেহেতু সর্ব্বদা যোগ অভ্যাসের দ্বারা অনন্যচিত্ত হইয়া তাঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে লোক দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়" ‡।

এখানে আমরা এই পরম পুরুষের প্রথম বর্ণনা পাইতেছি,—ইনি ভগবান, ইনি অক্ষর অপেক্ষাও মহত্তর ও বৃহত্তর, গীতা পরে ইহাঁকেই পুরুষোত্তম নাম দিয়াছে। তাঁহার কালাতীত অনন্ততায় তিনিও অক্ষর এবং এই সব ব্যক্ত প্রপঞ্চের বহু উপরে; কালের মধ্যে আমরা তাঁহার সত্তার সামান্য আভাস মাত্র পাই নানা বিচিত্র রূপ ও ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া (অব্যক্তোঽক্ষরঃ)। তথাপি তিনি শুধুই অরূপ অনির্দ্দেশ্য নহেন, অথবা তিনি কেবল এই জন্যই অনির্দ্দেশ্য যে, মানুষের মন যত বেশী সূক্ষ্মতার ধারণা

---

* যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৮।৬

‡ তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ং ॥ ৮।৭
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮।৮

করিতে পারে, তিনি তাহা হইতেও সূক্ষ্ম এবং ভগবানের রূপ আমাদের চিন্তার অতীত,—অণোরণীয়াংসম্ অচিন্ত্যরূপম্ * । এই পরম পুরুষ পরমাত্মাই দ্রষ্টা, অতি পুরাতন। তাঁহার অনন্ত আত্মদৃষ্টি ও জ্ঞানে তিনিই সমগ্র বিশ্বের প্রভু এবং শাস্তা। তিনি তাঁহার সত্তার মধ্যে এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন,—কবিম্ পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ সর্ব্বস্য ধাতারম্। বেদবিদ্‌গণ যে স্বয়ম্ভু অক্ষরব্রহ্মের কথা বলেন, এই পরমাত্মাই সেই ব্রহ্ম। যতিগণ তপস্যার দ্বারা মানসিক বিক্ষেপসমূহের উপর উঠিয়া ইহাঁর মধ্যেই প্রবেশ লাভ করেন,—ইহাঁকেই পাইবার জন্য তাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করেন ‡। সেই অনন্ত সদ্বস্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি, স্থান, পদ (অতএব কালের মধ্যে জীবাত্মার যে বিকাশ হইতেছে, সেই বিকাশলীলার ইহাই পরম লক্ষ্য); কিন্তু ইহার মধ্যে কোন বিকাশের খেলা নাই, ইহা এক আদি, সনাতন, পরম অবস্থা বা স্থান,—পরমম্ স্থানম্ আদ্যম্।

---

* কবিং পুরাণমনুশাসিতার
মণোরণীয়াং সমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ—
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৮।৯

‡ যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেন প্রবক্ষ্যে ॥ ৮।১১

যোগী অন্তিমকালে মনের যে ভাবে থাকিয়া জীবন হইতে মৃত্যুর ভিতর দিয়া এই পরম দিব্য স্থানে পৌছান, গীতা তাহারই বর্ণনা করিতেছে। অচঞ্চল মন, যোগবলে বলীয়ান্ আত্মা, ভক্তিতে ভগবানের সহিত যোগ (জ্ঞানের দ্বারা নিরাকারের সহিত যোগ থাকে বলিয়া ভক্তিযোগ নিষ্প্রয়োজন হয় না, শেষ পর্যন্ত এই ভক্তি পরম যোগশক্তির অঙ্গরূপেই বিদ্যমান থাকে); এবং প্রাণশক্তি ভ্রূমধ্যে, দিব্যদৃষ্টির অধিষ্ঠানে সংগৃহীত *। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হয়, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করা হয়, প্রাণশক্তিকে বিক্ষেপ হইতে সংগ্রহ করিয়া মস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়; বুদ্ধি ওম্ এই পবিত্র অক্ষরের উচ্চারণ এবং ইহার ভাব ধারণা করিতে এবং পরম পুরুষকে স্মরণ করিতে একাগ্র হয়, (মামনুস্মরন্) ‡। ইহাই দেহত্যাগের প্রচলিত যৌগিক পন্থা,—বিশ্বাতীত অনন্তের নিকট সমগ্র শেষ সমর্পণ। তথাপি, ইহা কেবল একটি প্রক্রিয়া মাত্র; মূল প্রয়োজন হইতেছে, জীবনে, এমন কি যুদ্ধ ও কর্ম্মের মধ্যেও, সর্ব্বদা অব্যভিচারী ভাবে ভগবানকে স্মরণ

---

* প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ৮।১০

‡ সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ৮।১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ৮।১৩

করা,—মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ—, এবং সমগ্র জীবনযাত্রাকে বিরতিহীন যোগে পরিণত করা (নিত্যযোগ) * । ভগবান বলিলেন, "যে ইহা করে সে অনায়াসে আমাকে লাভ করে; সেই মহাত্মাই পরম্ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ‡ ।

এইরূপে জীব যখন দেহত্যাগ করিয়া যায়, তখন সে যে অবস্থায় পৌঁছায়, তাহা বিশ্বাতীত (Supracosmic) অবস্থা। বিশ্বপ্রপঞ্চে যে সকল উচ্চতম স্তরের জগৎ রহিয়াছে, সেখান হইতেও পুনর্জন্মে ফিরিয়া আসিতে হয়; কিন্তু যে-জীব পুরুষোত্তমে গমন করিয়াছে সে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে ‡ । অতএব জ্ঞানের দ্বারা অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া যে ফলই পাওয়া যাউক, অন্যতম পূর্ণ উপাসনা জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমের সম্মিলনের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মের অধীশ্বর, সকল মানুষের ও সর্ব্বভূতের সুহৃদ স্বয়ম্ভূ ভগবানের উপাসনা করিয়াও সেই ফল পাওয়া যায়। তাঁহাকে এইরূপে জানায় এবং এইভাবে তাঁহার উপাসনা করায় পুনর্জন্মে বা কর্ম্মশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না; মরলোকের অনিত্য দুঃখময় অবস্থা হইতে (দুঃখালয়ম অশাশ্বতম্) চিরন্তন মুক্তিলাভ করিতে জীবের যে আকাঙ্ক্ষা, জীব তাহা পূর্ণ করিতে পারে।

---

* অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ৮।১৪

‡ মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ৮.১৫

‡ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮।১৬

জন্মান্তর-চক্র এবং সেই চক্র হইতে মুক্তিলাভ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা দিবার জন্য গীতা এখানে জগৎচক্রের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে যে মত সুপ্রচলিত ছিল তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। জগৎ যে সময়ে প্রকট থাকে তাহাকে ব্রহ্মার দিবস বলা হয়, জগৎ যে সময়ে অপ্রকট থাকে তাহাকে ব্রহ্মার রজনী বলা হয়। কালের পরিমাণে উভয়েই সমান। ব্রহ্মার কর্ম্ম চলে সহস্রযুগ ধরিয়া, আবার ব্রহ্মার নিদ্রাও সহস্র নীরব যুগ *। দিবসাগমে ব্যক্ত বস্তু সকল অব্যক্তের মধ্য হইতে আবির্ভূত হয়, রাত্রি সমাগমে সকলে অদৃশ্য হয় বা অব্যক্তের মধ্যে লীন হয় †। এইরূপে সর্ব্বভূত অবশভাবে প্রকাশ ও প্রলয়ের চক্রে ঘুরিতেছে; পুনঃ পুনঃ তাহারা দিবসাগমে আবির্ভূত হইতেছে (ভূত্বা ভূত্বা), এবং অবিরত তাহারা রাত্রিসমাগমে অব্যক্তের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে ‡। কিন্তু এই অব্যক্তই ভগবানের দিব্য আদ্য অবস্থা নহে; তাঁহার আর এক অবস্থা (ভাবোঽন্যঃ) আছে, বিশ্বের এই অব্যক্তাবস্থার উপরেও এক বিশ্বাতীত অব্যক্ত, তাহা অনন্তকাল স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহা এই ব্যক্ত বিশ্বের বিপরীত অব্যক্ত নহে কিন্তু ইহার বহু উপরে, ইহা হইতে সম্পূর্ণ

* সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিংযুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদোজনাঃ ॥ ৮।১৭

† অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ৮।১৮

‡ ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ৮।১৯

বিভিন্ন, অপরিবর্ত্তনীয়, সনাতন,—সর্ব্বভূত বিনষ্ট হইলেও তাহা বিনষ্ট হয় না *। "তাঁহাকেই অব্যক্ত অক্ষর বলা হয়, তাঁহাকেই লোকে পরমাত্মা এবং পরমা গতি বলে। যাহারা তাঁহাতে পৌঁছায় তাহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না; তাহাই আমার পরম ধাম" ‡। কারণ, যে জীবাত্মা সেখানে পৌঁছিয়াছে, সে বিশ্বের প্রকাশ ও প্রলয়চক্র হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

জগৎ-চক্র সম্বন্ধে এই মত আমরা গ্রহণ করি আর না করি, ("অহোরাত্রবিদ্"গণের জ্ঞানের মূল্য আমাদের কাছে কতখানি তাহার উপরেই উহা নির্ভর করে) গীতা ইহাকে যেভাবে ব্যবহার করিয়াছে তাহাই দ্রষ্টব্য। সহজেই ধারণা হইতে পারে, এই যে সনাতন, অব্যক্ত সত্তা, যাহার পরম ভাবের সহিত বিশ্বের অভিব্যক্তি বা লয়ের কোনই সম্বন্ধ নাই বলিয়া মনে হয়, উহাই চির-অনির্দ্দেশ্য, অজ্ঞাত, নিরুপাধিক ব্রহ্ম; এবং উহাতে পৌঁছিতে হইলে, জীবনলীলায় আমরা যাহা হইয়াছি, সেই সব বর্জ্জন করাই আমাদের পক্ষে প্রকৃত পন্থা। মনের জ্ঞান, হৃদয়ের ভক্তি, যৌগিক ইচ্ছা, জাগ্রত প্রাণশক্তি—এই সব সম্মিলিত ভাবে একাগ্র করিয়া উহার দিকে আমাদের সমগ্র আন্তর চেতনাকে লইয়া যাওয়া ঠিক পথ নহে। বিশেষতঃ যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সকল সম্বন্ধশূন্য, অব্যবহার্য্য, তাহার প্রতি ভক্তি প্রযুজ্য বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু, গীতা

---

* পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ৮।২০

‡ অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৮।২১

জোর দিয়াই বলিয়াছে, যদিও এই অবস্থা বিশ্বাতীত, এবং যদিও ইহা চির-অব্যক্ত, তথাপি "সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তির দ্বারাই লাভ করিতে হইবে, যাঁহার মধ্যে সর্ব্বভূত বিরাজ করিতেছে, যিনি এই সমগ্র জগৎকে বিস্তার করিয়াছেন *।" অর্থাৎ এই পরম পুরুষ আমাদের মায়ার জগৎ হইতে দূরে অবস্থিত একেবারে সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য ব্রহ্ম নহেন। পরন্তু তিনি দ্রষ্টা, স্রষ্টা, এই জগৎ-সমূহের শাস্তা, কবিম্ অনুশাসিতারম্, ধাতারম্। তাঁহাকেই এক এবং সব, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জানিয়া ও ভক্তি করিয়া, সকল বস্তু, সকল ঘটনা, সকল কর্ম্মে তাঁহার সহিত আমাদের সমগ্র চেতনাকে যুক্ত করিয়াই আমাদিগকে পরমা গতি, পূর্ণ সিদ্ধি, চরম মুক্তির সাধনা করিতে হইবে।

তাহার পরই আরও রহস্যময় এক সিদ্ধান্তের বর্ণনা। এইটি গীতা প্রাচীন বৈদান্তিক সাধকগণের (mystics) নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। যোগী যদি পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন্ সময়ে দেহত্যাগ করিতে হইবে, আর যদি পুনর্জন্ম এড়াইতে চান তাহা হইলেই বা তাঁহাকে কোন্ সময়ে দেহত্যাগ করিতে হইবে, তাহারই বর্ণনা ‡। অগ্নি ও জ্যোতিঃ এবং ধূম বা কুহেলিকা, দিবস এবং রাত্রি, শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ, উত্তরায়ন এবং দক্ষিণায়ন—এই গুলি পরস্পর

---

* পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ ৮।২২

‡ যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ৮।২৩

বিপরীত। প্রথমগুলিতে দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু দ্বিতীয়গুলির দ্বারা যোগী চান্দ্রমস জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন এবং পরে তাঁহাকে মানবজন্মে ফিরিয়া আসিতে হয় *। এই দুইটিই শুক্ল ও কৃষ্ণমার্গ। উপনিষদে এই দুইটিকে যথাক্রমে দেবযান ও পিতৃযান বলা হইয়াছে। যে যোগী এই দুই মার্গের তত্ত্ব জানেন, তাঁহাকে আর কোন ভ্রমে পতিত হইতে হয় না ‡। এই তত্ত্বের পশ্চাতে জড়জগৎ ও মনোজগতের সম্বন্ধবিষয়ক যে কোন সত্য বা সঙ্কেত-সূত্রই থাকুক ‡ (এই বিশ্বাস প্রাচীন সাধকদের

---

* অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ৮।২৪
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ৮।২৫

‡ শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ৮।২৬
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তাস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ৮।২৭

‡ যৌগিক অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, এই তত্ত্বের পশ্চাতে জড়জগৎ ও মনোজগতের সম্বন্ধবিষয়ক একটা সত্য রহিয়াছে, যদিও তাহা সর্ব্বত্র খাটে না, যথা—অন্তরে আলোকের শক্তির সহিত অন্ধকারের শক্তির যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে আলোকের শক্তিসমূহ বৎসরের এবং দিনের আলোর সময়ে অধিকতর প্রভাবশালী হয় এবং অন্ধকার শক্তিগুলির প্রভাব অন্ধকার সময়ে বর্দ্ধিত হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত শেষ জয় লাভ না হয়, ততক্ষণ এইরূপ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে।

যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারা প্রত্যেক জড়বস্তুতে মনোজগতের প্রকৃত সঙ্কেত দেখিতেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র ভিতরের সহিত বাহিরের, আলোকের সহিত জ্ঞানের, অগ্নির সহিত তপঃ-শক্তির পারম্পরিক ক্রিয়া ও কতকটা ঐক্যও নির্ণয় করিতেন।)
—আমাদিগকে কেবল দেখিতে হইবে যে, গীতা এখানে কথাটিকে কি ভাবে ঘুরাইয়া শেষ করিয়াছে, "অতএব সকল সময়ে যোগযুক্ত থাক",—তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন।

ফলতঃ, মূল কথা এই, সমস্ত সত্তাকে ভগবানের সহিত এক করা। এমন সমগ্র ভাবে এবং সর্ব্ব রকমে এক, যেন সর্ব্বদা স্বাভাবিকভাবে যোগযুক্ত হইয়া থাকা যায়। এবং এইরূপে সমগ্র জীবনটিকে, শুধু চিন্তা বা ধ্যানকে নহে, কিন্তু কর্ম্ম, প্রয়াস, যুদ্ধ সবকেই ভগবানের অনুস্মরণে পরিণত করা। "আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর", ইহার অর্থ অনন্তের নিত্য অনুস্মরণ যেন অনিত্য সংসারের দ্বন্দ্বের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও হারাইয়া না যায়। এবং ইহা খুবই কঠিন, প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ ইহা কেবল তখনই সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় যদি অন্যান্য প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করা হয়।—যদি আমরা আমাদের চেতনায় সকলের সহিত এক আত্মা হইয়া থাকি, সকল সময়ে আমাদের মনে থাকে যে, সেই এক আত্মা ভগবান, এবং আমাদের চক্ষু ও আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বত্র ভগবানকে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করে যেন কোন জিনিষকে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বলিয়া কখনও ভুল করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, পরন্তু ঐ বাহ্য রূপের মধ্যে ভগবানকে একই সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ও ব্যক্ত দেখিতে পারি, এবং যদি আমাদের ইচ্ছা ভগবানের ইচ্ছার সহিত চেতনায় এক হয়, এবং

আমাদের ইচ্ছার, মনের, শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়া ঐ ভগবদিচ্ছা হইতেই আসিতেছে বলিয়া অনুভব করি,—উহা ভগবদিচ্ছারই ক্রিয়া, ভগবদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত, অথবা তাহার সহিত একই বলিয়া উপলব্ধি করি, তাহা হইলে গীতা যাহা চাহিতেছে তাহা পূর্ণভাবে সম্পাদন করা যায়। তখন আর ভগবানের অনুস্মরণ মনের একটা সাময়িক ব্যাপার হয় না; পরন্তু তখন উহাই হয় আমাদের জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা এবং একভাবে আমাদের চেতনার সার বস্তু। তখন জীব তাহার স্বাধিকার লাভ করিয়াছে, পুরুষোত্তমের সহিত তাহার সত্য ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ, অধ্যাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে,—তখন আমাদের সমস্ত জীবনই যোগ, ভগবানের সহিত ঐক্য,—সে ঐক্য সিদ্ধ, আবার অনন্তকাল ধরিয়াই তাহা সাধিত হইয়া চলিয়াছে।

গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং

যে সত্যটি এইভাবে ধীরে ধীরে পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রতিপদে অখণ্ড জ্ঞানের এক একটি নূতন দিক ব্যক্ত করিয়াছে এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এক-একটি অধ্যাত্ম ভাব ও কর্ম্ম, তাহার মূল্য ও সার্থকতা এইবার আমরা বুঝিব। সেই-হেতু ভগবান অর্জ্জুনের মনকে জাগ্রত ও একাগ্র করিয়া তুলিবার জন্য, তিনি এখন যাহা বলিতে যাইতেছেন, তাহার গুরু প্রয়োজনীয়তার দিকে প্রথমেই তাহার অবধান আকর্ষণ করিলেন। কারণ, তিনি অর্জ্জুনের মনকে পূর্ণ-ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান ও দৃষ্টির জন্য উন্মুক্ত করিতে এবং একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন; সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধা তাহার জীবনের, কর্ম্মের, লক্ষ্যের যিনি কর্ত্তা ও ভর্ত্তা, মানুষের মধ্যে ও জগতের মধ্যে যিনি ভগবান, তাঁহার সম্বন্ধে সজ্ঞান হইবে, মানুষের মধ্যে বা জগতের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে; কারণ, তাঁহা হইতেই সবের উৎপত্তি, তাঁহার অনন্ত সত্তার মধ্যেই সবার খেলা, তাঁহার ইচ্ছার দ্বারাই সব চলিতেছে, বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার দিব্যজ্ঞানের মধ্যেই সবের সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তিনিই সকলের মূল ও সারবস্তু ও চরম লক্ষ্য। অর্জ্জুনকে জানিতে হইবে যে, সে নিজে ভগবানেরই মধ্যে রহিয়াছে এবং অন্তরস্থিত শক্তির দ্বারাই কাজ করিতেছে, তাহার কাজ কেবল ভাগবত কর্ম্মের নিমিত্ত মাত্র, তাহার অহঙ্কৃত চেতনা কেবল একটা আচ্ছাদন,

তাহার মধ্যে ভগবানের যে অমর স্ফুলিঙ্গ ও অংশ রহিয়াছে, তাহাই তাহার অজ্ঞানে বিকৃত হইয়া অহংচেতনা রূপে প্রতিভাত হইতেছে।

তাহার মনে এখনও যদি কোনও সংশয় থাকে, এই বিশ্বরূপ-দর্শনই তাহা দূর করিয়া দিবে, এবং তাহাকে সেই কাজের জন্য শক্তিমান করিয়া তুলিবে, যে-কাজ হইতে সে পশ্চাৎপদ হইয়াছে, সেই কাজের জন্য সে অলঙ্ঘ্য ভাবে নিয়োজিত, তাহার আর ফেরা চলে না,—কারণ ফিরিলে তাহার মধ্যে ভগবানের ইচ্ছা ও আদেশকে অমান্য করা হইবে, এই আদেশ ইতিপূর্ব্বেই তাহার ব্যক্তিগত চেতনায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বিরাট বিশ্ব-লীলার মধ্যেও যে সে-কর্ম্মের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, শীঘ্রই তাহা প্রকাশিত হইবে। কারণ এখন বিশ্ব-পুরুষ ভগবানেরই দেহরূপে অর্জ্জুনের সম্মুখে দেখা দিবেন, অনন্ত কাল সেই দেহের আত্মা, তিনি তাঁহার মহান্ ভীতি-ব্যঞ্জক স্বরে অর্জ্জুনকে যুদ্ধের সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিবেন। অর্জ্জুন তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইবে আত্মার মুক্তি-সাধন করিতে, এই বিশ্ব-রহস্যের মধ্যে তাহার কর্ম্ম সম্পাদন করিতে, এবং এই দুইটি—মুক্তি-সাধন ও কর্ম্ম—একই সাধনা হইবে। অর্জ্জুনের সম্মুখে আত্মজ্ঞানের উচ্চতর আলোক এবং ভগবান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান যতই বেশী উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, ততই তাহার বুদ্ধির সংশয় সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। কিন্তু কেবল বুদ্ধির সংশয় পরিষ্কার হইলেই চলিবে না; তাহাকে দেখিতে হইবে অন্তর্দ্দৃষ্টির দ্বারা যাহা তাহার বহির্মুখী মানবীয় দৃষ্টিকে আলোকিত করিবে, যেন সে কর্ম্ম করিতে পারে, সমগ্র সত্তার সম্মতির সহিত, তাহার প্রতি অঙ্গের পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত,

তাহার মধ্যে যে-আত্মা তাহার জীবনের অধীশ্বর আবার সেই আত্মাই বিশ্বের এবং সমগ্র বিশ্বজীবনের অধীশ্বর সেই একই আত্মার প্রতি পূর্ণ ভক্তির সহিত।

ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সে-সব জ্ঞানের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছে, অথবা ইহার প্রথমে প্রয়োজনীয় উপাদান প্রস্তুত করিয়াছে, কিন্তু এখন কাঠামোটির পূর্ণ আকার তাহার উন্মুক্ত দৃষ্টির সম্মুখে ধরা হইবে। ইহার পরে যাহা আসিবে সে-সবও খুবই প্রয়োজনীয়; কারণ, সে-সব এই কাঠামোর অংশ-গুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবে, কোন্‌টীর কি মর্ম্ম তাহা বুঝাইয়া দিবে; কিন্তু যে-পুরুষ তাহার সহিত কথা কহিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান মূলতঃ এখনই তাহার চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া ধরা হইবে যেন না দেখা আর তাহার পক্ষে সম্ভব না হয়। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে তাহাকে দেখান হইয়াছে, অজ্ঞান ও অহঙ্কৃত কর্ম্মের গ্রন্থিতে তাহাকে যে অবশ্যম্ভাবী-ভাবে বাঁধা থাকিতেই হইবে তাহা নহে,—এইরূপ কর্ম্মেই সে এতদিন সন্তুষ্ট ছিল, শেষে উহা আর তাহার মনকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই, উহাতে কোনও সমস্যারই পূর্ণ সমাধান নাই, সংসারের কর্ম্মের মধ্যে যে বিরোধী ভাব রহিয়াছে, তাহাতে তাহার মন বিভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কর্ম্মের জালে বদ্ধ হইয়া তাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল, জীবন ও কর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা ব্যতীত কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তির কোন পথই সে দেখিতে পায় নাই। তাহাকে দেখান হইয়াছে যে, কর্ম্ম ও জীবন-যাত্রার দুইটি বিরোধী পথ আছে, একটি হইতেছে অহংএর অজ্ঞানে, অপরটি হইতেছে সত্তার স্পষ্ট আত্মজ্ঞানে। সে কর্ম্ম করিতে

পারে বাসনার সহিত, রিপুর বশে, নীচের প্রকৃতির গুণত্রয়ের দ্বারা তাড়িত "অহং" রূপে, পাপ পুণ্যের সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বের অধীন হইয়া, কর্ম্মের ফল ও পরিণামের চিন্তায়, জয় পরাজয়ের, শুভ ও অশুভের চিন্তায় বিভোর থাকিয়া, জগৎ-চক্রে বদ্ধ হইয়া, কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্ম যে পরিবর্ত্তনশীল বিরোধী ভাবের দ্বারা মানুষের হৃদয়, মন, আত্মাকে বিভ্রান্ত করে, সে সকলের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়া। কিন্তু অজ্ঞানের কর্ম্মেই সে অকাট্য ভাবে বদ্ধ নহে; সে যদি ইচ্ছা করে তবে জ্ঞানের কর্ম্মও করিতে পারে। সংসারে সে কর্ম্ম করিতে পারে উচ্চ ভাবুক রূপে, জিজ্ঞাসু রূপে, যোগী রূপে, প্রথমে মুক্তি-প্রার্থী রূপে এবং পরে মুক্ত-আত্মা রূপে। এই মহান্ সম্ভাবনা উপলব্ধি করা এবং যে-জ্ঞান ও আত্ম-দৃষ্টি কার্য্যতঃ উহা সম্ভব করিবে তাহাতে তাহার বুদ্ধিকে নিবিষ্ট রাখা, ইহাই তাহার দুঃখ ও মোহ হইতে মুক্তি পাইবার, মানব-জীবনের সমস্যা হইতে মুক্তি পাইবার পথ।

আমাদের মধ্যে এক অধ্যাত্ম সত্তা আছে, তাহা শান্ত, কর্ম্মের অতীত, সম, এই বাহিরের কর্ম্মজালে বদ্ধ নহে, কিন্তু উহার ধাতা, উৎপত্তি-স্থল, অন্তর্যামী সাক্ষী রূপে উহাকে পর্য্যবেক্ষণ করে, অথচ উহাতে জড়িত হয় না। উহা অনন্ত, সবকে ভিতরে ধরিয়া রাখিয়াছে, সকলের মধ্যে এক আত্মা, প্রকৃতির সমগ্র কর্ম্মকে নিরপেক্ষ ভাবে অবলোকন করিতেছে এবং দেখিতেছে যে. এ-সব কেবল প্রকৃতির কর্ম্ম, তাহার নিজের কর্ম্ম নহে। উহা দেখে যে, অহং এবং অহংয়ের ইচ্ছা ও বুদ্ধি সবই প্রকৃতির যন্ত্র, এবং ইহাদের সকল কর্ম্মই প্রকৃতির তিন গুণের জটিল ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ সনাতন অধ্যাত্ম সত্তা নিজে ঐ সব হইতে মুক্ত। এই সব

হইতে সে মুক্ত, কারণ তাহার জ্ঞান আছে, সে জানে যে প্রকৃতি এবং অহং এবং এই সকল জীবের ব্যক্তিক সত্তা (the personal being) ইহা লইয়াই অস্তিত্ব নহে। কারণ জগতে অনবরত যে ক্ষর-লীলা চলিতেছে, মহান্ বা তুচ্ছ, চমকপ্রদ বা বিষাদজনক নিখিল পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্য—কেবল ইহাই অস্তিত্বের (existence) সবটুকু নহে। এমন কিছু আছে যাহা সনাতন, অক্ষর, অক্ষয়, কালাতীত স্বয়ম্ভু সত্তা; প্রকৃতির পরিবর্ত্তনসকল তাহাকে স্পর্শ করে না। উহা সে-সবের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা, কাহাকেও বিচলিত করে না, নিজেও বিচলিত হয় না, নিজে কোনও কর্ম্ম করে না, কাহারও কর্ম্ম তাহাকে স্পর্শ করে না, সে পুণ্যবানও নহে, পাপীও নহে; কিন্তু নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মহান্ এবং অক্ষত। অহংভাবাপন্ন মানব যাহাতে ব্যথিত বা আকৃষ্ট হয় উহা তাহাতে শোকান্বিত বা হর্ষান্বিত হয় না, উহা কাহারও মিত্রও নহে, কাহারও শত্রুও নহে, কিন্তু সকলের মধ্যে এক সম আত্মা। মানুষ এখন এই আত্মা সম্বন্ধে সচেতন নহে, কারণ সে বহির্মুখী মনের মধ্যে জড়াইয়া রহিয়াছে, সে অন্তরের মধ্যে বাস করিতে শিখিতে চায় না, অথবা শিখে নাই; নিজের কর্ম্ম হইতে নিজেকে সে পৃথক করিয়া ধরে না, সরিয়া দাঁড়ায় না এবং ঐ কর্ম্মকে প্রকৃতির কর্ম্ম বলিয়া দেখে না। অহংই বাধা, মোহচক্রের নাভি। জীবের অন্তরাত্মায় অহংয়ের লয় করাই মুক্তির জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। অধ্যাত্ম সত্তা হওয়া, আর কেবল মন এবং অহং হইয়া না থাকা, ইহাই এই মুক্তি-বাণীর প্রথম কথা।

অর্জ্জুনকে এই জন্য প্রথমেই বলা হইয়াছে তাহার কর্ম্মের সমস্ত ফল-কামনা পরিত্যাগ করিতে এবং যাহাই করিতে হউক

সেই কর্ত্তব্য শুধু নিষ্কাম নিরপেক্ষ কর্ম্মী ভাবে সম্পাদন করিতে,—এই বিশ্বকর্ম্মসমূহের যিনিই ঈশ্বর হউন তাঁহার হস্তে সমস্ত ফলাফল ছাড়িয়া দিতে। কারণ, সে নিজে যে ঈশ্বর নহে তাহা খুবই সুস্পষ্ট। তাহার ব্যক্তিগত অহংয়ের তৃপ্তির জন্য প্রকৃতি আপনার পথে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তাহার বাসনা, তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বিশ্ব-প্রাণ জীবন-লীলা করিতেছে না; তাহার মানসিক মতামত, তাহার সিদ্ধান্ত ও আদর্শ সার্থক করিবার জন্য বিশ্ব-মন কাজ করিতেছে না, তাহার ক্ষুদ্র দরবারে বিশ্ব-মনের জাগতিক লক্ষ্য বা পার্থিব কর্ম্মধারা ও উদ্দেশ্য উপস্থিত করা হয় না। এই সব অধিকারের দাবী কেবল সেই সকল লোকে করে যাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্বের গণ্ডীর মধ্যে বাস করে এবং সেই ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ প্রতিষ্ঠা হইতে সমস্ত জিনিষকে দেখে। প্রথমেই তাহাকে জগতের উপর তাহার অহঙ্কারের দাবী ছাড়িতে হইবে, এবং লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে সে কেবল একজন মাত্র এই ভাবে তাহাকে কাজ করিতে হইবে। যে ফলাফল তাহার দ্বারা নির্ণীত নহে কিন্তু নিখিল কর্ম্ম ও উদ্দেশ্যের দ্বারা নির্ণীত হইতেছে, তাহাতে তাহার নিজের চেষ্টা ও যত্নের অংশটুকু জোগাইতে হইবে। কিন্তু তাহাকে ইহা অপেক্ষা আরও বেশী কিছু করিতে হইবে,—সে যে কর্ত্তা এই অভিমানও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সকল ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া তাহাকে দেখিতে হইবে যে, নিখিল বুদ্ধি, ইচ্ছা, মন, প্রাণই তার মধ্যে এবং অপর সকলের মধ্যে কর্ম্ম করিতেছে। প্রকৃতিই নিখিল কর্ত্তা; তার কর্ম্ম প্রকৃতিরই কর্ম্ম, ঠিক যেমন তার মধ্যে প্রকৃতির কর্ম্মের ফল তার চেয়ে এক মহত্তর শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মহান ফলসমষ্টির অংশমাত্র।

অধ্যাত্মভাবে সে যদি এই দুইটি জিনিষ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার কর্ম্মের জাল ও বন্ধন তাহা হইতে খসিয়া পড়িবে; কারণ, ঐ বন্ধনের সমস্ত গ্রন্থি রহিয়াছে তাহার অহঙ্কারের দাবীতে এবং কর্তৃত্বাভিমানে। রিপুর উদ্বেগ ও পাপ এবং ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ তাহার আত্মা হইতে অদৃশ্য হইবে। তখন তাহা শুদ্ধ, মহান্, শান্ত, সকল লোক ও সকল জিনিষে সমভাবাপন্ন হইয়া অন্তরের মধ্যে বাস করিবে। কর্ম্ম তখন অন্তরের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিবে না, তাহার আত্মার নির্ম্মলতা ও শান্তির উপর কোন দাগ বা চিহ্ন রাখিয়া যাইবে না। তাহার থাকিবে অভ্যন্তরীণ সুখ, বিরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, এবং মুক্ত অক্ষত সত্তার অটুট আনন্দ। ভিতরে বা বাহিরে আর তাহার সেই পুরাতন ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের জের থাকিবে না; কারণ, সে তখন সজ্ঞানে উপলব্ধি করিবে যে, সে সকলের সহিত এক আত্মা,—তাহার বাহ্য প্রকৃতিও নিখিল মন, প্রাণ, ইচ্ছার অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়াই তাহার জ্ঞানে অনুভূত হইবে। তাহার স্বতন্ত্র অহংভাবাপন্ন সত্তা অধ্যাত্ম সত্তার নির্ব্যক্তিক ভাবের মধ্যে গৃহীত ও নির্ব্বাপিত হইবে; তাহার স্বতন্ত্র অহংভাবাপন্ন প্রকৃতি বিশ্ব-প্রকৃতির লীলার সহিত একীভূত হইবে।

কিন্তু, এই মুক্তি নির্ভর করে দুইটি যুগপৎ উপলব্ধির উপরে,—স্পষ্টভাবে আত্মদর্শন এবং স্পষ্টভাবে প্রকৃতি দর্শন। এই দুইটি উপলব্ধির সামঞ্জস্য এখনও হয় নাই। ইহা কেবল বৈজ্ঞানিকের মানসিক বিচারজনিত নিঃসঙ্গতা নহে, জড়বাদী দার্শনিকও, নিজের আত্মা এবং অধ্যাত্ম সত্তার উপলব্ধি না থাকিলেও শুধু প্রকৃতি সম্বন্ধেই কতকটা স্পষ্ট দৃষ্টি লাভ করিয়া এরূপ নিঃসঙ্গ হইতে

পারে। ইহা ভাববাদী জ্ঞানীরও (the idealistic sage) মানসিক বিচারজনিত নিঃসঙ্গতা নহে। এরূপ ব্যক্তি বুদ্ধির আলোক সহায়ে অহংয়ের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং বিক্ষোভকরী রূপগুলি অতিক্রম করিতে পারে। ইহা আরও বড়, আরও জীবন্ত, আরও পূর্ণ আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতা। প্রকৃতির উপরে, মন-বুদ্ধির উপরে যে পরম সত্তা রহিয়াছে, তাহার দর্শন লাভ করিয়াই এই নিঃসঙ্গতা লাভ করা যায়। কিন্তু, এই নিঃসঙ্গতাও মুক্তির এবং স্পষ্ট জ্ঞানদৃষ্টির কেবল গোড়াকার রহস্য, ইহা দিব্যরহস্যের সমগ্র সূত্র নহে; কারণ, শুধু এইটির দ্বারাই প্রকৃতির ব্যাখ্যা হয় না; এবং অধ্যাত্ম ও নিষ্ক্রিয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সহিত কর্ম্মজীবনের বিরোধ থাকিয়া যায়। দিব্য নিঃসঙ্গতা হইবে দিব্য কর্ম্মেরই ভিত্তি। আগে যেমন অহং-ভাবের বশে প্রকৃতির কার্য্যে যোগ দেওয়া হইত, তাহার পবিবর্ত্তে দিব্য-ভাবে প্রকৃতির কার্য্যে যোগ দিতে হইবে, দিব্য শান্তি দিব্য ক্রিয়াকে, দিব্য গতিকে ধরিয়া থাকিবে। এই সত্য বরাবরই গুরুর মনে ছিল এবং সেই জন্যই তিনি যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতে, পরমপুরুষকেই আমাদের সকল কর্ম্মের ঈশ্বর বলিয়া জানিতে এবং অবতারের ও দিব্য-জন্মের মর্ম্ম বুঝিতে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন; কিন্তু শান্ত মুক্ত ভাবের প্রতিষ্ঠা প্রথমেই প্রয়োজন বলিয়া এই সত্যের উপর এতক্ষণ তেমন জোর দেওয়া হয় নাই। যে-সকল সত্যের দ্বারা আধ্যাত্মিক শান্তি, নিঃসঙ্গতা, সমতা এবং ঐক্য লাভ করা যায়, এক কথায়, অক্ষর আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, এবং তাহাই হওয়া যায় সেই সকল সত্যই পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে এবং তাহাদের বৃহত্তম শক্তি ও সার্থকতা দেখান হইয়াছে। অন্য যে মহান্ প্রয়োজনীয়

সত্য এই উপলব্ধিকে পূর্ণতর করিবে, সেটিকে কতকটা অস্পষ্ট রাখা হইয়াছে, অল্প আলোকে দেখান হইয়াছে। পুনঃপুনঃ এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেইটিকে পরিস্ফুট করা হয় নাই। এখন ক্রমান্বয়ে এই কয়েকটি অধ্যায়ে সেই সত্যকে দ্রুত পরিস্ফুট করা হইতেছে।

অবতার, গুরু, জীবন-যুদ্ধে মানবাত্মার চির-সারথি শ্রীকৃষ্ণ প্রথম হইতেই নিজের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। তাহাই প্রকৃতির গভীরতম রহস্য। এই উদ্যোগের মধ্যে একটি সুর তিনি সকল সময়েই ধরিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহার সমগ্র সত্যের বৃহত্তম চূড়ান্ত সমন্বয়ের ইঙ্গিত ও ভূমিকাস্বরূপ পুনঃ-পুনঃ তুলিয়াছেন। সেই সুর হইতেছে পরম ভগবানের তত্ত্ব। তিনি মানুষের মধ্যে ও প্রকৃতির মধ্যে বাস করিতেছেন; কিন্তু তিনি মানুষ ও প্রকৃতি হইতে মহত্তর, আত্মার নির্ব্যক্তিক ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহাকে পাইতে হয়। কিন্তু নির্ব্যক্তিক আত্মাই তাঁহার সমগ্র সত্য নহে। পুনঃপুনঃ জোরের সহিত এই সত্যের ইঙ্গিত কেন করা হইয়াছে, এখন আমরা তাহার অর্থ বুঝিতেছি। একই ভগবান যিনি বিশ্বাত্মায়, মানুষে ও প্রকৃতিতে রহিয়াছেন, তিনিই রথোপরি অবস্থিত গুরুর মুখ দিয়া উদ্যোগ করিতেছিলেন যেন, জাগ্রত দ্রষ্টা ও কর্ম্মীর সমগ্র সত্তার উপর তিনি তাঁহার একান্ত দাবী উপস্থিত করিতে পারেন। তিনি বলিতেছিলেন "আমি তোমার অন্তরে রহিয়াছি, আমি এখানে এই মানব শরীরে রহিয়াছি। আমার জন্যই সব কিছুর অস্তিত্ব, সকলে কর্ম্ম করে, চেষ্টা করে। সেই আমিই স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মারও নিগূঢ় সত্য; আবার সেই সঙ্গে বিশ্বলীলারও নিগূঢ় সত্য। এই যে 'আমি,'

ইহাই মহত্তর আমি। যত বড় মানব—সত্তাই হউক না কেন, তাহা এই 'আমি'র এক ক্ষুদ্র আংশিক প্রকাশমাত্র,—প্রকৃতি নিজে ইহারই এক নীচের খেলা মাত্র। জীবাত্মার ঈশ্বর, বিশ্বের সকল কর্ম্মের ঈশ্বর, আমিই অদ্বিতীয় জ্যোতিঃ, একমাত্র শক্তি, এক মাত্র সত্তা। তোমার অন্তরে এই ভগবানই গুরু, সবিতা, —সেই জ্ঞানের স্পষ্ট জ্যোতির প্রকাশকর্ত্তা, যাহাতে তুমি তোমার অক্ষর আত্মা এবং তোমার ক্ষর প্রকৃতির প্রভেদ দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু এই জ্যোতিরও উপরে উহার উৎসের দিকে চাহিয়া দেখ; তাহা হইলে তুমি পরম আত্মাকে জানিতে পারিবে, তাহারই মধ্যে ব্যক্তিত্বের ও প্রকৃতির অধ্যাত্ম সত্যকে ফিরিয়া পাইবে। অতএব সর্ব্বভূতের মধ্যে এক আত্মাকে দেখ, যেন এই ভাবে তুমি সর্ব্বভূতের মধ্যে আমাকে দেখিতে পার। সর্ব্বভূতকে এক অধ্যাত্ম আত্মা এবং সত্য বস্তুর মধ্যে দেখ; কারণ, সর্ব্বভূতকে আমার মধ্যে দেখিবার ইহাই পন্থা। সকলের মধ্যে এক ব্রহ্মকে অবগত হও; কারণ, এই ভাবেই তুমি পরম ব্রহ্ম ভগবানকে দেখিতে পাইবে। তোমার নিজের আত্মাকে অবগত হও, নিজের আত্মা হও, যেন এই ভাবে তুমি আমার সহিত যুক্ত হইতে পার,—এই কালাতীত আত্মা আমারই স্পষ্ট জ্যোতি বা স্বচ্ছ আবরণ। ভগবান আমিই আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তার চরম সত্য।"

অর্জ্জুনকে দেখিতে হইবে যে, এই একই ভগবান শুধু আত্মার উচ্চতর সত্য নহেন, পরন্তু প্রকৃতির এবং তাহার নিজের ব্যক্তিত্বেরও উচ্চতর সত্য,—একই সঙ্গে ব্যক্তির এবং বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য। তাঁহারই ইচ্ছা প্রকৃতিতে সর্ব্বব্যাপী, প্রকৃতির কর্ম্মসকল তাঁহা হইতেই আসিতেছে। তিনি সেই সকল কর্ম্ম অপেক্ষা

মহত্তর,—প্রকৃতির, কর্ম্ম, মানুষের কর্ম্ম এবং সেই সকল কর্ম্মের ফল সবই তাঁহার। অতএব তাহাকে যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে ; কারণ, সেইটিই হইতেছে তাহার কর্ম্মের, সকল কর্ম্মের প্রকৃত সত্য। প্রকৃতিই কর্ম্মী, অহং কর্ম্মী নহে ; কিন্তু প্রকৃতি ভগবানের একটা শক্তিমাত্র,—ভগবানই প্রকৃতির সকল কর্ম্মের ও চেষ্টার একমাত্র প্রভু,—বিশ্বযজ্ঞের যুগযুগান্তরের একমাত্র ঈশ্বর। তাহার কর্ম্ম যখন ভগবানের, তখন তাহার মধ্যে ও জগতে যে ভগবান রহিয়াছেন, যাঁহার দ্বারাই প্রকৃতির রহস্যময় দিব্যলীলায় ঐ সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাঁহাকেই তাহার সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিতে হইবে। আত্মার দিব্য জন্মের জন্য, অহংয়ের এবং শরীরের মরত্ব হইতে অধ্যাত্ম ও অনন্তের মধ্যে মুক্তিলাভের জন্য এই দুইটী প্রয়োজন—প্রথমে নিজের কালাতীত অক্ষর আত্মার জ্ঞান ও ইহার ভিতর দিয়া কালাতীত ভগবানের সহিত মিলন। কিন্তু সেই সঙ্গেই এই বিশ্ব-রহস্যের পশ্চাতে যিনি রহিয়াছেন, সর্ব্বভূতের মধ্যে এবং তাহাদের ক্রিয়ার মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধেও জ্ঞান। কেবল এইরূপই আমরা আমাদের সমস্ত প্রকৃতি ও সত্তাকে সমর্পণ করিয়া সেই একের সহিত জীবন্তভাবে যুক্ত হইবার আশা করিতে পারি, যিনি দেশ কালের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব হইয়াছেন। পূর্ণ আত্মমুক্তির যোগসাধনায় ভক্তির স্থান এইখানেই। অবিনাশী আত্মা বা পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতি এতদুভয় অপেক্ষাও যিনি মহত্তর, তাঁহার ভজনা ও আরাধনাই এই ভক্তি। তখন সকল জ্ঞান হয় ভজনা ও আরাধনা ; কিন্তু সকল কর্ম্মও হয় ভজনা ও আরাধনা। এই ভজনাতেই প্রকৃতির কর্ম্ম এবং আত্মার মুক্তি একীভূত হইয়াছে, এবং সেই এক ভগবানের উদ্দেশে এক আত্মোৎসর্গে পরিণত হইয়াছে। চরম মুক্তি, নীচের প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উপরে

অধ্যাত্মভাবের মূলে যাওয়া, ইহা আত্মার নির্ব্বাণ নহে,—কেবল তাহার অহংরূপেরই নির্ব্বাণ হয়। কিন্তু ইহা হইতেছে আমাদের জ্ঞান-ইচ্ছা-প্রেমময় সমগ্র আত্মার পক্ষে ভগবানের বিশ্বসত্তার মধ্যে আর না থাকিয়া, বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে গমন করা,—ইহা ধ্বংস নহে, সিদ্ধি।

অর্জ্জুনের মনের কাছে এই জ্ঞানটি স্পষ্ট করিয়া ধরিবার জন্য আবশ্যক বলিয়া শ্রীগুরু বাকী দুইটি সংশয়ের মূলোচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইলেন,—নির্ব্যক্তিক সত্তা ও মানুষের ব্যক্তিগত সত্তার মধ্যে বিরোধ এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই দুইটি দ্বন্দ্ব থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতির মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে ভাগবত সত্তার অস্তিত্ব অস্পষ্ট, অসঙ্গত, অবিশ্বাস্য থাকিয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, প্রকৃতি গুণসমূহের জড় শৃঙ্খলা, আত্মা এই শৃঙ্খলের অধীন অহঙ্কৃত সত্তা। কিন্তু ইহাই যদি তাহাদের সমস্ত সত্য হয়, তাহা হইলে তাহারা ভাগবত সত্তা নহে, হইতেই পারে না। জড় অজ্ঞান প্রকৃতি ভগবানের শক্তি হইতে পারে না; কারণ, ভগবানের শক্তি হইবে কর্ম্মে স্বাধীন, মূলে আধ্যাত্মিক, মহত্ত্বে আধ্যাত্মিক। প্রকৃতিতে বদ্ধ অহঙ্কৃত আত্মা, কেবল মনোময় প্রাণময়, দেহময় আত্মা, কখনই ভগবানের অংশ এবং নিজে ভাগবত সত্তা হইতে পারে না; কারণ যাহা এইরূপ ভাগবত সত্তা হইবে, তাহা হইবে স্বরূপে ভগবানেরই ন্যায় মুক্ত, অধ্যাত্ম, আত্মবিকাশশীল, স্বপ্রতিষ্ঠ,—তাহা হইবে মন, প্রাণ, দেহের ঊর্দ্ধে। এই দুই সংশয় এবং তাহারা যে-অজ্ঞানের সৃষ্টি করে সে-সব অপসৃত হয় সত্যের একটি মাত্র উজ্জল দীপ্ত রশ্মির দ্বারা। জড়প্রকৃতি কেবল একটা নীচের সত্য; নীচের প্রতিভাসিক ক্রিয়াই জড়-

প্রকৃতি নামে অভিহিত। উপরের এক প্রকৃতি আছে, তাহা অধ্যাত্ম প্রকৃতি এবং তাহাই আমাদের অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, আমাদের সত্য ব্যক্তিসত্তা। ভগবান একই সঙ্গে নির্ব্যক্তিক (impersonal) অবার ব্যক্তিক (personal)। আমাদের মনের অনুভূতিতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার নির্ব্যক্তিক ভাব কালের অতীত অনন্ত সদ্‌স্বরূপ চিদ্‌স্বরূপ, অস্তিত্বোপলব্ধির আনন্দস্বরূপ ; তাঁহার ব্যক্তিক ভাব দেখা যায় সত্তার সচেতন শক্তিরূপে, জ্ঞানের, ইচ্ছার এবং বহুধা আত্মপ্রকাশের আনন্দের সচেতন কেন্দ্ররূপে। মূল অক্ষর সত্তায় আমরাও সেই একই নির্ব্যক্তিক; আমাদের অধ্যাত্ম-ব্যক্তিস্বরূপে আমরা প্রত্যেকেই সেই মূল শক্তির বহুধা রূপ। কিন্তু এই যে প্রভেদ, ইহা কেবল আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনের জন্য। দিব্য নির্ব্যক্তিক সত্তাকে ছাড়াইয়া যাইলে দেখা যায় যে, উহাই আবার অনন্ত পুরুষ, পরমাত্মা। উহাই মহান্ অহম্—সোঽহম্, আমিই সেই,—যাঁহা হইতে সমস্ত ব্যক্তিক সত্তা ও প্রকৃতি আবির্ভূত হয় এবং নির্ব্যক্তিকভাবে প্রতীয়মান এই যে জগৎ, ইহার মধ্যে বিচিত্ররূপে লীলা করে। যাহা কিছু রহিয়াছে সবই ব্রহ্ম,—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ইহাই উপনিষদের কথা, কারণ ব্রহ্ম এক আত্মা, নিজেকে ক্রমান্বয়ে চৈতন্যের চারি স্তরে দেখিতেছেন। বাসুদেব অনন্ত পুরুষই সব, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, ইহাই গীতার কথা। তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার উর্দ্ধের অধ্যাত্ম প্রকৃতি হইতে তিনি সজ্ঞানে সমস্ত উৎপাদন করিতেছেন, ধরিয়া রাখিয়াছেন। এখানে বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের বাহ্যদৃশ্য লইয়া যে অপরা প্রকৃতি, তাহার মধ্যে সকল বস্তু তিনিই সজ্ঞানে হইয়াছেন। অনন্তের সেই অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে তিনিই জীব, জীব তাঁহার সনাতন বহুরূপ, সচেতন আত্মশক্তির বহু কেন্দ্র হইতে তাঁহারই

আত্মদর্শন। ভগবান, প্রকৃতি, জীব— এই তিন লইয়াই বিশ্বলীলা এবং এই তিনই এক সত্তা।

এই সত্তা নিজেকে বিশ্বের মাঝে কেমন করিয়া প্রকাশ করে? প্রথমতঃ অক্ষর কালাতীত আত্মা রূপে,—তাহা সর্ব্বব্যাপী, সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার অনন্ততায় তাহা শুধু সত্তা, তাহাতে কোন বিকাশ বা লীলা নাই। তার পর, সেই সত্তায় বিধৃত রহিয়াছে এক মূল শক্তি বা আত্মবিকাশের অধ্যাত্ম ধারা,—স্বভাব। তাহার ভিতর দিয়াই অধ্যাত্ম আত্মদৃষ্টির দ্বারা এই সত্তা সঙ্কল্প করে, বিকাশ করে,—ইহার মধ্যে যাহা কিছু অপ্রকাশিত রহিয়াছে, নিহিত রহিয়াছে, সেই সকলকে মুক্ত করিয়া দিয়া সৃষ্টি করে। এই ভাবে আত্মায় যাহা কিছু সঙ্কল্পিত হয়, সেই আত্মবিকাশের শক্তি বা তেজ বিশ্বের মাঝে সেই সবকে কর্ম্মরূপে বিসৃষ্ট করে। সকল সৃষ্টিই এই ক্রিয়া, মূল প্রকৃতির লীলা, কর্ম্ম। কিন্তু এই সংসারে উহা পরিণত হইয়া উঠিতেছে অপরা প্রকৃতির মধ্যে,—বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূল ভূতের বাহ্য রূপের মধ্যে। তাহা পূর্ণ আলোক হইতে বস্তুতঃ বিচ্ছিন্ন, এবং অজ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। সেখানে তাহার সকল ক্রিয়াই হয় প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশে প্রকৃতিস্থ জীবাত্মার যজ্ঞ। অতএব পরম ভগবান সকলের মধ্যেই তাহাদের যজ্ঞের অধীশ্বর রূপে, অধিযজ্ঞ রূপে বিরাজিত। তাঁহার সান্নিধ্যে, তাঁহার শক্তিতেই সেই যজ্ঞ নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁহার আত্মজ্ঞানে এবং আত্মসত্তার আনন্দে তাহা গৃহীত হয়। ইহা জানিলেই বিশ্ব সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা হয়, জগৎ-মাঝে ভগবানকে দর্শন করা হয় এবং

অজ্ঞান মায়া হইতে মুক্ত হইবার দ্বার খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কারণ, এই জ্ঞান যখন কার্য্যতঃ সত্যে পরিণত হয়, মানুষ তাহার কর্ম্ম এবং তাহার সমস্ত চেতনাকে সর্ব্বভূতস্থিত ভগবানে অর্পণ করে। তখন সেই জ্ঞানের দ্বারা সে তাহার অধ্যাত্ম সত্তায় ফিরিয়া যাইতে সক্ষম হয় এবং ইহার ভিতর দিয়া এই অপরা ক্ষর প্রকৃতির উপরে অনন্ত ও ভাস্বর যে বিশ্বাতীত সত্য বস্তু রহিয়াছে, তাহাতে পৌঁছিতে সমর্থ হয়।

আমাদের মূল সত্তার এই যে নিগূঢ় সত্য, আমাদের অভ্যন্তরীণ জীবন ও বাহ্যকর্ম্ম বিকাশে কেমন করিয়া ইহা পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যায়, গীতা এখন তাহাই দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছে। গীতা এখন যাহা বলিতেছে তাহা সকল রহস্যের গুহ্যতম রহস্য *। ইহাই ভগবান সম্বন্ধে সেই সমগ্র জ্ঞান,—সমগ্রম্ মাম্,—অর্জ্জুনকে যাহা দিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাই সমস্ত তত্ত্বের পূর্ণ বিজ্ঞানসহ মূল জ্ঞান, যাহা জানিলে আর জানিতে কিছু বাকী থাকে না। যে অজ্ঞান তাহার মানবীয় মনকে বিমূঢ় করিয়াছে, এবং তাহার ভগবদ্‌নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে তাহার

---

* ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥২
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩
গীতা, নবম অধ্যায়।

ইচ্ছাকে বিমুখ করিয়াছে, সেই অজ্ঞানের গ্রন্থি ইহার দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে ছেদিত হইবে। ইহাই সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, সকল রহস্যের শ্রেষ্ঠ রহস্য, রাজ-বিদ্যা, রাজগুহ্য। ইহা শুদ্ধ এবং উত্তম জ্যোতি। প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম উপলব্ধির দ্বারা মানুষ ইহার প্রমাণ পায়, নিজের মধ্যেই সত্য বলিয়া দেখিতে পারে। ইহাই প্রকৃত সত্যধর্ম্ম, জীবনের মূল নীতি। মানুষ যখন ইহাকে ধরিতে পারে, দেখিতে পারে এবং শ্রদ্ধার সহিত এই অনুসারে জীবনকে গঠিত করিতে চায়, তখন ইহার অনুসরণ করা সহজ হয়।

কিন্তু শ্রদ্ধা চাই। শ্রদ্ধা যদি না থাকে, মানুষ যদি তর্ক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে সেই উচ্চতর জ্ঞানকে জীবনে সত্য করিয়া তোলা সম্ভব হয় না। তর্কবুদ্ধি বাহ্য ব্যাপারের অনুগমন করে, অধ্যাত্মদৃষ্টিলব্ধ জ্ঞানকে সন্দেহের সহিত যাচাই করিয়া দেখিতে চায় কারণ তাহা দৃশ্য প্রকৃতির দ্বন্দ্ব ও অপূর্ণতা সমূহের সহিত মিলে না,—মনে হয়, তাহা এই দ্বন্দ্বময় প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতেছে,—এমন কথা বলিতেছে, যাহা আমাদিগকে আমাদের বর্ত্তমান জীবনের প্রত্যক্ষ শোক, দুঃখ, অমঙ্গল, দোষ, ভ্রান্তি ও অক্ষমতা হইতে, অশুভ হইতে উপরে লইতে চায়। যে-জীব সেই উপরের সত্য ও ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, তাহাকে মৃত্যু, ভ্রান্তি, অশুভের অধীন সাধারণ মরজীবনের পথে ফিরিতেই হইবে। যে-ভাগবত সত্তাকে সে অস্বীকার করে, তাহাতে গড়িয়া উঠা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ এই যে সত্য, জীবনের মাঝে ইহাকে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে, ইহারই অনুসরণে জীবনকে গঠিত ও পরিচালিত

করিতে হইবে,—আত্মার ক্রমবর্দ্ধনশীল জ্যোতিতে অনুসরণ করিতে হইবে,—মনের অন্ধকারে তর্কবুদ্ধির সহায়ে নহে। মানুষকে এই সত্যে গড়িয়া উঠিতে হইবে, এই সত্য হইতে হইবে,—ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার ইহাই এক মাত্র উপায়। নীচের সত্তাকে অতিক্রম করিয়াই মানুষ প্রকৃত দিব্যসত্তা হইতে পারে এবং আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের সত্যকে জীবনের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। সত্য বলিয়া যাহা কিছু ইহার বিরুদ্ধে উত্থাপন করা যায়—সে সমস্তই নীচের প্রকৃতির বাহ্যিক সত্য। নীচের প্রকৃতির অপূর্ণতা ও অমঙ্গল হইতে, "অশুভ" হইতে, মুক্তিলাভ করা যায় কেবল এক উর্দ্ধের জ্ঞানকে স্বীকার করিয়া,—যেখানে ঐ সকল বাহ্যিক অশুভ শেষ পর্য্যন্ত মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, আমাদেরই অজ্ঞানের সৃষ্টি বলিয়া প্রদর্শিত হয়। কিন্তু এই ভাবে দিব্য প্রকৃতির মুক্তিতে গড়িয়া উঠিতে হইলে আমাদের বর্ত্তমান বদ্ধ প্রকৃতিতে প্রচ্ছন্নভাবে যে ভাগবত সত্তা রহিয়াছেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই ইহবে। কারণ, এই যোগাভ্যাস সম্ভব ও সহজ কেবল এই জন্যই হয় যে, আমরা স্বভাবতঃ যাহা, সে সমুদায়ের ক্রিয়াকে এই সাধনায় সেই অভ্যন্তরীণ দিব্যপুরুষের হস্তে আমরা সমর্পণ করিয়া দিই। ভগবানই আমাদের মধ্যে দিব্য জন্মের বিকাশ করিয়া দেন ক্রমবর্দ্ধনশীলভাবে, সহজভাবে, অব্যর্থভাবে, আমাদের সত্তাকে তাঁহারই সত্তার মধ্যে তুলিয়া লইয়া এবং ইহাকে তাঁহারই জ্ঞানে ও শক্তিতে পূর্ণ করিয়া দিয়া,—জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা,—তিনি তাঁহার কল্যাণ হস্তের স্পর্শে আমাদের মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞান প্রকৃতিকে তাঁহারই নিজের জ্যোতিঃ ও বিশালতায় রূপান্তরিত করিয়া লন। আমরা পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত এবং অহংভাবশূন্য হইয়া যাহাতে

বিশ্বাস করি এবং ভগবদ্‌প্রেরণায় যাহা হইতে চাই, অন্তরস্থিত ভগবান তাহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিয়া দিবেন। কিন্তু এখন যে অহংভাবময় মন ও প্রাণ আমাদের প্রকৃত সত্তা বলিয়া অনুমিত হইতেছে, প্রথমেই প্রয়োজন যে সেইটি আমাদের অন্তরস্থিত গুহ্য ভগবানের হস্তে নিজেকে রূপান্তরের জন্য একান্তভাবে সমর্পণ করে।

দিব্য সত্য ও পন্থা

গীতা অতঃপর সেই চরম ও পূর্ণ রহস্য, সেই এক তত্ত্ব ও সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে চলিয়াছে,—সিদ্ধি ও মুক্তির প্রার্থীকে যাহাতে বাস করিতে শিখিতে হইবে, সেই এক ধর্ম্মকে অনুসরণ করিয়াই তাহার অধ্যাত্ম অঙ্গসমূহের এবং তাহাদের সকল প্রক্রিয়ার পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে হইবে। এই চরম সত্য হইতেছে বিশ্বাতীত ভগবানের রহস্য,—তিনিই সব এবং সর্ব্বত্র বিরাজিত; অথচ বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল রূপ অপেক্ষা তিনি এত মহত্তর ও বিভিন্ন যে, এখানে কোন কিছুর মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ নহেন, কোন কিছুই বস্তুতঃ তাঁহাকে প্রকট করিতে পারে না,—দেশ ও কালের মধ্যে যে-সব বস্তু আবির্ভূত হইয়াছে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে-সম্বন্ধ, এই সকল বুঝাইতে যে-ভাষা প্রয়োগ করা হয় তাহা তাঁহার অচিন্ত্য সত্তার স্বরূপ ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে। অতএব আমাদের সিদ্ধিলাভের নীতি হইতেছে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি দিয়া ভজনা এবং ইহার মূল অধিকারীর নিকট আত্মসমর্পণ। সব শেষে আমাদের এক পথ হইতেছে, এই সংসারে আমাদের সমগ্র জীবনকে (শুধু ইহার কোন এক অংশকেই নহে) অনন্তের দিকে একাগ্র ভাবে প্রবাহিত করা। এক দিব্য যোগের শক্তি ও রহস্যের দ্বারা আমরা তাঁহার অনির্ব্বচনীয় নিগূঢ় সত্তার মধ্য হইতে এই প্রতিভাসিক জগতের সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে আসিয়াছি। সেই যোগেরই এক বিপরীত প্রক্রিয়ার দ্বারা আমাদিগকে প্রতিভাসিক প্রকৃতির সকল সীমা অতিক্রম করিতে হইবে, এবং সেই মহত্তর চেতনাকে ফিরিয়া

পাইতে হইবে, যাহার দ্বারা আমরা ভগবানের মধ্যে, অনন্তের মধ্যে, বাস করিতে পারিব।

ভগবানের যে শ্রেষ্ঠতম সত্তা তাহা অব্যক্ত—কখনও প্রকাশিত হয় না। তাঁহার যে সত্য শাশ্বত মূর্ত্তি তাহা জড়ের মধ্যে ব্যক্ত হয় না, প্রাণও তাহাকে ধরিতে পারে না, মনও তাহাকে চিন্তা করিতে পারে না,—অচিন্ত্যরূপ, অব্যক্তমূর্ত্তি *। আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা কেবল ভগবানের আত্মসৃষ্ট রূপ,—তাঁহার শাশ্বত রূপ, স্বরূপ নহে। এমন একজন আছেন, অথবা এমন এক সত্তা আছে, যাহা বিশ্ব হইতে ভিন্ন, অপ্রকাশ্য, অচিন্ত্য, এক অনির্ব্বচনীয় অনন্ত ভাগবত সত্তা,—অনন্ত সম্বন্ধে আমরা যতই বিরাট বা যতই সূক্ষ্ম ধারণা করি না কেন, সেই সত্তা সে ধারণার বহু উর্দ্ধে। এই যে-সকল জিনিষের সমবায়কে আমরা বিশ্বজগৎ বলিয়া অভিহিত করি, এই যে-সব বিরাট গতিশীলতার সমষ্টি যাহার কোনও সীমানা আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি না এবং যাহার বিভিন্ন রূপ ও প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা কোনও স্থায়ী বস্তু খুঁজিয়া পাই না, দাঁড়াইয়া ধরিবার মত কোন স্থান, স্তর বা কেন্দ্র খুঁজিয়া পাই না—সে-সব এই উর্দ্ধতন অনন্ত সত্তা কর্ত্তৃক প্রকট হইয়াছে, নির্ম্মিত হইয়াছে, এই অনির্ব্বচনীয়, বিশ্বাতীত রহস্যের উপরে সে সব বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। এক আত্ম-অভিব্যক্তির উপরে এই সব বিধৃত রহিয়াছে, তাহা নিজে অব্যক্ত, অচিন্ত্য। এই যে সব সৃষ্টি অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, চলিতেছে, এই সব জীব, সব ভূত, সব জিনিষ, সব জীবন্ত মূর্ত্তি,—ইহারা সকলে মিলিয়া অথবা স্বতন্ত্র ভাবে তাঁহাকে ধারণ করিতে

* ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ গীতা ৯।৪

পারে না। তিনি তাহাদের মধ্যে নাই, তাহাদের মধ্যে, তাহাদের দ্বারা তাঁহার জীবন ও কর্ম্মের লীলা চলিতেছে না,—ভগবান এই ভূতজগৎ নহেন। তাহারাই তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, তাহাদেরই জীবন ও কর্ম্মের লীলা তাঁহার মধ্যে চলিতেছে, তাঁহা হইতেই তাহাদের সত্য উদ্ভূত; তাহারা তাঁহার ভূত (becomings), তিনি তাঁহাদের মূল সত্তা (being), মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ। অন্তহীন দেশ ও কালের মধ্যে এই যে সীমাহীন জগৎ, ভগবান তাঁহার সত্তার অচিন্ত্য দেশকালাতীত অনন্তের মধ্যে ইহাকে এক ক্ষুদ্র ব্যাপার রূপে বিস্তৃত করিয়াছেন।

সব তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, ইহা বলিলেও আবার এ বিষয়ের সমস্ত সত্যটা বলা হয় না, প্রকৃত সম্বন্ধটা সমগ্র ভাবে বলা হয় না; কারণ, এরূপ বলিলে ভগবানের উপর দেশ-বাচক ভাব আরোপ করা হয়। কিন্তু ভগবান দেশ ও কালের অতীত ‡। দেশ ও কাল, অনুস্যূতি (immanence) ও ব্যাপ্তি (pervasion) ও অতিক্রান্তি (exceeding)—এ-সব তাঁহার চৈতন্যের খেলা। তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তির এক যোগ আছে,—মে যোগঃ ঐশ্বরঃ—সেই যোগের দ্বারা পরম ভগবান তাঁহার আপনার অনন্ত আত্মরূপায়ণের মধ্যে নিজের নানা নামরূপের প্রকাশ করেন, সে আত্মরূপায়ণ জড় নহে, অধ্যাত্ম,—জড়জগৎ সেই আত্মরূপায়ণের কেবল বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি মাত্র। তাহার সহিত তিনি নিজেকে এক করিয়া দেখেন, তাহার সহিত এবং তাহার মধ্যে যাহা কিছু আশ্রয় পাইয়াছে, সেই সকলের সহিত ভগবান

---

‡ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৯। ৫

একীভূত হন। এই অনন্ত আত্মদর্শন তাঁহার সমগ্র আত্মদর্শন নহে (pantheist মতানুসারে ভগবানের সহিত বিশ্বকে যে এক বলা হয় তাহা ইহা অপেক্ষা আরও সঙ্কীর্ণ)। এই আত্মদর্শনে তিনি যাহা কিছু আছে সবের সহিত এক, আবার সেই সঙ্গেই তিনি সেই সবের অতীত, কিন্তু এই যে আত্মা বা অধ্যাত্মসত্তার বিস্তৃত অনন্ততা যাহা বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াও বিশ্বের অতীত, ভগবান ইহা হইতেও অন্য। তাঁহার বিশ্বচেতন অনন্ত সত্তার মধ্যে এখানে সব কিছুই রহিয়াছে, কিন্তু আবার সেইটিকেও ভগবানের বিশ্বাতীত সত্তা আত্মচেতনার এক সৃষ্টিরূপে ধরিয়া রহিয়াছে,—আমরা বিশ্ব বা সত্তা বা চেতনা বলিতে যাহা বুঝি, ভগবানের সেই বিশ্বাতীত সত্তা সে সকলেরই উপরে। ইহাই ভগবানের সত্তার নিগূঢ় রহস্য যে, তিনি বিশ্বাতীত, অথচ তিনি একেবারেই যে বিশ্বের বাহিরে তাহাও নহে। কারণ এই সবের আত্মারূপে তিনি সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন। ভগবানের এক ভাস্বর মুক্ত আত্মসত্তা,—মম আত্মা—সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে, সর্ব্বভূতের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ, তিনি কেবল আছেন বলিয়াই সকলে বিশ্বলীলায় আবির্ভূত হইতেছে,—ভূতভূন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ। এই জন্যই আমরা দুইটি তত্ত্ব পাইতেছি, সৎ (being) ও সৃষ্টি (becoming), স্বপ্রতিষ্ঠিত আত্মা এবং ইহার উপরে প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বভূত, ভূতানি, ক্ষর সত্তা এবং অক্ষর সত্তা। কিন্তু এই যুগল তত্ত্বের উচ্চতম সত্য এবং তাহাদের মধ্যে বিরোধের সমন্বয় কেবল সেইখানেই পাওয়া যাইতে পারে যাহা এই বিরোধের অতীত, তাহা পরম ভগবান, তিনি তাঁহার যোগমায়ার (অর্থাৎ অধ্যাত্মচেতনার শক্তির) দ্বারা আধার আত্মা এবং আধেয় সর্ব্বভূত এতদুভয়কেই প্রকট করিতেছেন। আমাদের অধ্যাত্মচেতনায়

তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়াই আমরা তাঁহার সত্তার সহিত আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধের সন্ধান পাইতে পারি।

দার্শনিকের ভাষায় গীতার এই শ্লোকগুলির ইহাই অর্থ; কিন্তু তাহাদের ভিত্তি মানসিক যুক্তিতর্কের উপর নহে, পরন্তু অধ্যাত্ম উপলব্ধির উপরে। তাহারা সমন্বয় সাধন করে কারণ অধ্যাত্মচেতনার কতকগুলি সত্য হইতে তাহারা অখণ্ডভাবে উঠিয়াছে। জগতে গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে যে পরম বা বিশ্বব্যাপী সত্তাই থাকুক আমরা যখন তাহার সহিত নিজেদের সচেতন সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করি, তখন বহুপ্রকারের বিভিন্ন উপলব্ধি আমরা পাই, এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকের বুদ্ধি এই বিচিত্র উপলব্ধির কোন একটি বিশেষ দিককে লইয়া জগতের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণায় উপনীত হয়। প্রথমেই আমরা এক ভাগবত সত্তার অস্পষ্ট উপলব্ধি পাই,—তিনি আমাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও মহত্তর, আমরা যে জগতে বাস করিতেছি তাহা হইতেও তিনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও মহত্তর—কেবল এইটুকুই, আর বেশী কিছু উপলব্ধি হয় না যতক্ষণ আমরা আমাদের বাহিরের সত্তার মধ্যে বাস করি এবং আমাদের চতুর্দ্দিকে জগতের প্রতিভাসিক (phenomenal) রূপটাই নিরীক্ষণ করি। কারণ পরম ভগবানের যে পরম সত্য তাহা বিশ্বাতীত, এবং যাহা কিছু বাহিরের, প্রতিভাসিক, মনে হয় সে-সব স্ব-চেতন আত্মার আনন্ত হইতে ভিন্ন, মনে হয় তাহা এক নীচের সত্যের প্রতিচ্ছবি, হয় ত বা একেবারেই মিথ্যা ভ্রম, মায়া। যতক্ষণ আমরা এই ভেদজ্ঞান লইয়া চলি, ততক্ষণ মনে হয় যে, ভগবান বিশ্বের বাহিরে অবস্থিত। তিনি তাই, শুধু এই অর্থে যে, যেহেতু তিনি বিশ্বাতীত সেইহেতু তিনি বিশ্বের মধ্যে এবং বিশ্বের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ

নহেন, কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, এ সব তাঁহার সত্তার বাহিরে; কারণ সেই এক অনন্ত ও সত্য বস্তুর বাহিরে কিছুই নাই। ভগবান সম্বন্ধে এই প্রথম সত্য আমরা অধ্যাত্মভাবে উপলব্ধি করি যখন আমাদের অনুভূতি হয় যে, আমরা কেবল তাঁহার মধ্যেই বাস করিতেছি, তাঁহার মধ্যেই ঘুরিতেছি, ফিরিতেছি—তাঁহা হইতে আমরা যতই বিভিন্ন হই না কেন, আমাদের অস্তিত্বের জন্য আমরা তাঁহারই উপরে নির্ভর করি—এবং এই বিশ্বজগৎও আত্মারই কেবল একটা প্রকাশ ও লীলা।

কিন্তু আবার ইহা ছাড়াও আরও উপরের অনুভূতি আমরা পাই যে, আমাদের যে আত্মসত্তা তাহা তাঁহার আত্মসত্তার সহিত এক। সর্ব্বভূতের এক আত্মা আমরা উপলব্ধি করি এবং সে সম্বন্ধে আমরা চেতনা ও দৃষ্টিলাভ করি। তখন আর আমরা বলিতে পারি না বা ভাবিতে পারি না যে, আমরা তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; কিন্তু বুঝি যে, স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার আছে আত্মা (Self) এবং বহিঃপ্রকাশ (Phenomenon); আত্মাতে সকলেই এক, কিন্তু বহিঃপ্রকাশে সকলেই বিভিন্ন। কেবলমাত্র আত্মার সহিত একান্ত আবেগে যোগ সাধনা করিলে আমাদের এমনও অনুভূতি হইতে পারে যে, বহিঃপ্রকাশটা কেবল একটা স্বপ্নবৎ, অসত্য। কিন্তু আবার দুই দিকেই সমান আবেগ হইলে আমরা একই সঙ্গে দুই রকম অনুভূতি পাইতে পারি, আত্মসত্তায় তাঁহার সহিত এক পরম ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারি, অথচ উপলব্ধি হইতে পারে যে, আমরা তাঁহার সঙ্গে বাস করিতেছি, তাঁহার সহিত নানা ভাবে নিত্য সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া রহিয়াছি, প্রকৃত পক্ষে আমরা তাঁহার সত্তা হইতেই উৎপন্ন। এই বিশ্বজগৎ এবং বিশ্বজগতে আমাদের অস্তিত্ব এ-সবই আমাদের কাছে হয় ভগবানের স্ব-চেতন

সত্তার এক নিত্য ও সত্য রূপ। এই অপেক্ষাকৃত নীচের সত্যে আমরা পাই তাঁহার সহিত পার্থক্যের সম্বন্ধ,—অনন্তের অন্য সমস্ত চেতন বা অচেতন শক্তির সহিত আমাদের পার্থক্যের সম্বন্ধ, বিশ্ব-প্রকৃতিতে তাঁহার যে বিশ্ব-আত্মা রহিয়াছে তাহার সহিত আমাদের ব্যবহারের সম্বন্ধ। এই সকল সম্বন্ধ বিশ্বাতীত সত্য হইতে বিভিন্ন, তাহারা আত্মার চেতনার একটা শক্তির নীচের সৃষ্টি, এবং যেহেতু তাহারা বিভিন্ন এবং যেহেতু তাহারা সৃষ্ট সেইহেতু একমাত্র বিশ্বাতীত পরম বস্তুর উপাসকগণ এ সকলকে আংশিক বা সর্ব্বৈব ভাবেই মিথ্যা, মায়া বলিয়াই ঘোষণা করেন। অথচ এ-সকল তাঁহা হইতেই আসিয়াছে, তাঁহারই সত্তা হইতে উৎপন্ন রূপ—মিথ্যা শূন্য হইতে তাহারা সৃষ্ট হয় নাই। কারণ আত্মা সর্ব্বত্র যাহা দেখিতেছে সে সবই সে নিজে এবং তাহার নিজের রূপ, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কিছুই নহে। আর ইহাও আমরা বলিতে পারি না যে, এই সকল সম্বন্ধের অনুরূপ কিছুই বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে নাই। আমরা বলিতে পারি না যে, সেই মূল হইতে উৎপন্ন চৈতন্যশক্তির দ্বারা তাহারা সৃষ্ট অথচ সেই মূলে এমন কিছুই নাই যাহাতে তাহাদের ভিত্তি ও সার্থকতা, এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহার সত্তার এই সকল রূপের সনাতন সত্য এবং উপরের স্বরূপ।

আবার অন্য এক দিকে যদি আমরা আত্মা ও আত্মার রূপ সমূহ এতদুভয়ের পার্থক্যের উপরে জোর দিই, আমাদের উপলব্ধি হইতে পারে যে, আত্মা সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে,—সকলের মধ্যে অনুস্যূত। আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, আত্মা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তথাপি আত্মার রূপসমূহ, যে-সব আকারের মধ্যে আত্মা বিরাজমান, সে-সব যে আমাদের কাছে আত্মা হইতে বিভিন্ন বলিয়াই প্রতিভাত হইতে পারে, অনিত্যরূপ বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে, শুধু তাহাই নহে, সে-সব একেবারে অসত্য

ছায়ামাত্র বলিয়াই মনে হইতে পারে। একদিকে আমরা উপলব্ধি করিতেছি সেই আত্মাকে, সেই অক্ষর পুরুষকে যিনি নিজের দৃষ্টির মধ্যে বিশ্বের ক্ষর লীলাকে চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছেন, অন্যদিকে আমাদের এই অনুভূতিও হইতেছে যে, ভগবান আমাদের মধ্যে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন; এই অনুভূতিটি আগেকার অনুভূতি হইতে পৃথকভাবে হইতে পারে অথবা এক সঙ্গে হইতে পারে, অথবা মিশিয়া হইতে পারে। তথাপি আমাদের মনে হইতে পারে যে, বিশ্বজগৎ তাঁহার ও আমাদের চৈতন্যের একটা বাহ্য রূপ, অথবা একটা প্রতিরূপ বা প্রতীক যাহার দ্বারা আমরা তাঁহার সহিত সার্থক সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে পারি এবং ক্রমশঃ তাঁহার জ্ঞানে গড়িয়া উঠিতে পারি। কিন্তু আবার অন্যদিকে আমাদের আর এক প্রকার অধ্যাত্ম অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান হয় যাহাতে আমরা সব জিনিষকেই একেবারে ভগবান বলিয়া দেখিতেই বাধ্য হই,—এই জগতে এবং ইহার অগণ্য জীবের মধ্যে তিনি অক্ষররূপেই বিরাজিত নহেন, কিন্তু ভিতরে ও বাহিরে যাহা কিছু হইয়াছে সে সবই তিনি। তখন সবই হয় আমাদের কাছে এক দিব্য সত্য বস্তু যাহা আমাদের মধ্যে এবং জগতের মধ্যে আবির্ভূত হইতেছে। যদি কেবল এই অনুভূতিই হয়, তাহা হইলে আমরা সর্ব্বেশ্বরবাদীদের (Pantheists) ঐক্য পাই,—সেই একই সব। কিন্তু, সর্ব্বেশ্বরবাদীদের অনুভূতি কেবল আংশিক অনুভূতি। এই যে বিস্তৃত জগৎ ইহাই ভগবানের সবখানি নহে, ইহা অপেক্ষা মহত্তর এক অনন্ত আছে যাহার দ্বারা ইহার অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে। বিশ্ব ভগবানের সমগ্র চরম সত্য নহে, কেবল একটা আত্মাভিব্যক্তি, তাঁহার সত্তার একটা সত্য কিন্তু নীচের খেলা। এই সব অধ্যাত্ম উপলব্ধি,—প্রথম দৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে যতই বৈসাদৃশ্য বা বিরোধ দেখা যাউক,

তথাপি ইহাদের সমন্বয় করা যায় যদি আমরা ইহাদের মধ্যে কোন একটিরই উপরে সব জোর না দিই এবং যদি আমরা এই সহজ সত্যটি স্বীকার করি যে, ভাগবত সত্তা বিশ্বজগৎ অপেক্ষা বড়, কিন্তু তথাপি সব সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত জিনিষ সেই ভাগবত সত্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে,--সকলেই তাঁহার প্রকাশক বলিতে পারা যায়, তাহাদের কোন অংশে বা সমষ্টিতে তাহারা সেই সমগ্র সত্তা নহে, তথাপি সে-সব তাঁহার প্রকাশক হইতে পারিত না যদি তাহারা ভাগবত সত্তারই উপাদানে নির্ম্মিত না হইয়া অন্য কিছু হইত—সেইটিই সত্য বস্তু; কিন্তু তাহারা তাহার প্রকাশক সত্য বস্তু *।

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" বাক্যের দ্বারা ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে; যাহা কিছু এই বিশ্বজগৎ, যাহা কিছু এই বিশ্বজগতে রহিয়াছে এবং যাহা কিছু বিশ্বের উপরে সে সমুদায়ই ভগবান। গীতা প্রথমে তাঁহার বিশ্বাতীত সত্তার উপরেই ঝোঁক দিয়াছে। নতুবা মানুষের মন

---

* যদিও আমাদের মনের অনুভূতিতে চরম সত্যের পার্শ্বে এই গুলিকে অপেক্ষাকৃত অসত্য বলিয়াই অনুভূত হইতে পারে। শঙ্করের মায়াবাদে যে যুক্তিতর্ক আছে তাহা বাদ দিয়া, উহার মূলে যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি রহিয়াছে তাহা ধরিলে দেখা যায় যে, উহা এই আপেক্ষিক অসত্যতার অনুভূতিকে লইয়াই বাড়াবাড়ি করিয়াছে। মনের উপরে উঠিলে আর এই গোলমাল থাকে না, কারণ সেখানে ঐ গোলমাল কখনই ছিল না। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়, দার্শনিক সম্প্রদায় বা যোগপন্থার পশ্চাতে বিভিন্ন অনুভূতি রহিয়াছে, মনের ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে যে বিরোধ, গভীরতর অনুভূতির দ্বারা সে-সব বিরোধ দূর হইয়া যায় এবং অতিমানস অনন্তের ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য সাধিত হয়।

তাহার চরম লক্ষ্যকে হারাইয়া ফেলিবে এবং কেবল বিশ্বের দিকেই চাহিয়া থাকিবে, অথবা বিশ্বের মধ্যে ভগবানের কোন আংশিক উপলব্ধিতেই আসক্ত থাকিবে। পরে গীতা তাঁহার বিশ্বসত্তার উপরে জোর দিয়াছে, যাঁহার মধ্যে সকলে চলিতেছে, ফিরিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে। কারণ, ঐটিই বিশ্বলীলার সার্থকতা, ঐটিই ভগবানের বিরাট অধ্যাত্ম আত্ম-জ্ঞান, সেখানে ভগবান নিজেকে কাল-পুরুষ রূপে দেখিয়া তাঁহার বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম করিতেছেন। তাহার পর গীতা বেশ জোর দিয়াই স্বীকার করিতে বলিয়াছে যে, ভগবান মানবদেহের মধ্যে দিব্য অধিবাসীরূপে অধিষ্ঠিত। কারণ, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অধিষ্ঠিত পুরুষ, এবং যদি এই অন্তর্য্যামী পুরুষকে স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে কেবল যে ব্যষ্টিগত সত্তার কোন দিব্য সার্থকতা থাকিবে না এবং আমাদের উচ্চতম অধ্যাত্মজীবন-বিকাশের প্রেরণার শ্রেষ্ঠ শক্তি নষ্ট হইবে শুধু তাহাই নহে, পরন্তু সমাজের মধ্যে জীবের সহিত জীবের সম্বন্ধ থাকিয়া যাইবে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, অহঙ্কৃত। অবশেষে, গীতা বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যে ভগবানের প্রকাশ অতি বিস্তৃত ভাবেই দেখাইয়াছে এবং বলিয়াছে যে, জগতে যাহা কিছু আছে সে-সব এক ভগবানেরই প্রকৃতি, শক্তি ও চৈতন্য হইতে উদ্ভূত। কারণ, এই দৃষ্টিও ভাগবত-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মূলতঃ প্রয়োজনীয়; এই ভিত্তির উপরেই মানুষ তাহার সমগ্র সত্তা ও সমগ্র প্রকৃতিকে ভগবদ্ অভিমুখী করে, জগতে ভাগবত শক্তির কার্য্য স্বীকার করে, তাহার নিজের মন এবং ইচ্ছাশক্তিকে দিব্য কর্ম্মের স্বরূপে রূপান্তরিত করিবার সম্ভাবনা স্বীকার করে,—সে কর্ম্মের প্রেরণা আসে উপর হইতে, সে কর্ম্মের দ্বারা বিশ্বের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সে কর্ম্ম ব্যক্তির বা জীবের মধ্য দিয়াই সম্পাদিত হয়।

তাহা হইলে পরাৎপর ভগবান, বিশ্বচৈতন্যের পশ্চাতে অক্ষর পুরুষ, মানুষের মধ্যে ব্যষ্টিগত ভাগবত সত্তা, বিশ্বপ্রকৃতির এবং তাহার সকল কর্ম্ম ও জীবের মধ্যে গোপন ভাবে সচেতন অথবা আংশিক ভাবে প্রকট ভাগবত সত্তা,—এ সকলই এক সত্য বস্তু, এক ভগবান। কিন্তু সেই একই পুরুষের একটি ভাব সম্বন্ধে যে-সকল সত্য আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, তাঁহার অন্য ভাব সম্বন্ধে সে সত্যগুলি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিলে সে গুলি উল্টাইয়া যায় অথবা তাহাদের অর্থের পরিবর্ত্তন হয়। যেমন, ভগবান সব সময়েই ঈশ্বর; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা চারিটী ক্ষেত্রেই তাঁহার মূল ঈশ্বরত্ব ঠিক একই ভাবে, একই অর্থে প্রয়োগ করিতে পারি না। বিশ্ব-প্রকৃতিতে আবির্ভূত ভাগবত সত্তা রূপে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ঐক্যের সহিত কার্য্য করেন। বলিতে পারা যায় যে, তখন তিনি নিজেই প্রকৃতি, কিন্তু সেই প্রকৃতির কার্য্যের মধ্যে থাকে এক অধ্যাত্ম-চেতনা যাহা পূর্ব্ব হইতে সব দেখিতে পায়, পূর্ব্ব হইতে সব সঙ্কল্প করে, ইচ্ছা করে, সব বুঝিতে পারে, নিজের বলে সবকে পরিচালিত করে, কর্ম্ম ও শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মের ফল নিয়ন্ত্রিত করে। আবার সকলের শান্ত দ্রষ্টারূপে তিনি অকর্ত্তা, কেবল প্রকৃতিই কর্ত্তা। তিনি প্রকৃতিকে আমাদের স্বভাব অনুযায়ী এই সকল কর্ম্ম করিতে ছাড়িয়া দেন, স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে, অথচ তিনিই ঈশ্বর,—প্রভু, বিভু, কারণ তিনি আমাদের কর্ম্ম দেখেন, সমর্থন করেন এবং তাঁহার নীরব অনুমতির দ্বারা প্রকৃতিকে কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেন। তাঁহার নিষ্ক্রিয়তা দ্বারা তিনি পরাৎপর ভগবানের শক্তিকে তাঁহার সর্ব্বব্যাপী নিশ্চল অবস্থিতির ভিতর দিয়া প্রেরণ করেন এবং দ্রষ্টা পুরুষের সম-

ভাবের দ্বারা সকল বস্তুতে উহার ক্রিয়াকে সমর্থন করেন। পরাৎপর বিশ্বাতীত ভগবান রূপে তিনিই সকলের মূল স্রষ্টিকর্ত্তা; তিনি সকলের উপরে, সকলকে আবির্ভূত হইতে বাধ্য করেন; কিন্তু তিনি যাহা স্রষ্টি করেন তাহার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলেন না; অথবা তাঁহার প্রকৃতির কর্ম্মে নিজেকে আসক্ত করেন না। প্রকৃতির কর্ম্মে যে অলজ্ঘ্য নিয়মানুবর্ত্তিতা, তাহার পিছনে অধ্যক্ষরূপে রহিয়াছে তাঁহারই মুক্ত সত্তার ইচ্ছাশক্তি। ব্যষ্টিগত সত্তায় অজ্ঞানের সময় তিনি আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভগবান, সকলকে অবশভাবে প্রকৃতির যন্ত্রে ঘূর্ণায়মান করেন, সেই যন্ত্রের অংশস্বরূপ অহং (ego) ঘুরিতে থাকে, সেই অহং একটা বাধাও বটে আবার সেই সঙ্গে সহায়ও বটে। কিন্তু, প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পূর্ণ ভগবান বিরাজ করিতেছেন, অতএব আমরা অজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া এই অবশতার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠিতে পারি। কারণ, যে এক আত্মা সবকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহার সহিত নিজেদিগকে এক করিয়া আমরা সাক্ষী ও অকর্ত্তা হইতে পারি। অথবা আমরা আমাদের ব্যষ্টি সত্তায় আমাদের অন্তরস্থিত ভগবানের সহিত মানব-জীবের যাহা সত্য সম্বন্ধ তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, আমাদের প্রাকৃত অংশকে সাক্ষাৎ যন্ত্র বা নিমিত্ত করিতে পারি এবং আমাদের অধ্যাত্ম সত্তায় সেই অন্তর্যামী পুরুষের পরম, মুক্ত, আসক্তিহীন প্রভুত্বের ভাগী হইতে পারি। এইটিই আমাদিগকে গীতার মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখিতে হইবে; কোন্ সম্বন্ধের ক্ষেত্র হইতে প্রয়োগ করা হইতেছে সেই অনুসারে একই সত্যের যে এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হয় তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা যেখানে বাস্তবিক

কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই সেখানে আমরা তাহা দেখিতে পাইব, অথবা অর্জ্জুনের ন্যায় বলিতে হইবে, ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেণ বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।

তাই গীতা এই বলিয়া আরম্ভ করিল যে, ভগবান নিজের মধ্যে সবকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু, তিনি নিজে কাহারও মধ্যে নহেন,—মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ। আবার তখনই বলিল, "অথচ সর্ব্বভূত আমার মধ্যে অবস্থিত নহে, আমার আত্মা সর্ব্বভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অবস্থিত নহে।" আবার যেন আত্মবিরোধ করিয়াই গীতা বলিয়াছে যে, ভগবান মানব-শরীরের মধ্যে রহিয়াছেন, মানব-শরীরকে আশ্রয় করিয়াছেন,—মানুষীম্ তনুম্ আশ্রিতম্। বলিয়াছে যে,কর্ম্ম, ক ভক্তি ও জ্ঞানের যে পূর্ণ সাধনা, তাহার দ্বারা আত্মার মুক্তি সাধিতে হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই যে-সব কথার পরস্পরের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ এরূপ কোন বিরোধই নাই। ভগবানের যে বিশ্বাতীত সত্তা তাহাহি সর্ব্ব-ভূতের মধ্যে অবস্থিত নহে; সর্ব্বভূতও তাহার মধ্যে অবস্থিত নহে। কারণ, আমরা যে ভগবান ও সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রভেদ করি, তাহা কেবল প্রতিভাসিক জগতের লীলাতেই প্রযোজ্য। বিশ্বাতীত সত্তায় সমস্তই শাশ্বত পুরুষ, এবং যদি সেখানেও বহুত্ব থাকে তবে সকলেই শাশ্বত পুরুষ। এক বস্তুর মধ্যে আর এক বস্তু থাকা, এরূপ স্থানবাচক ভাব সেখানে প্রযোজ্য নহে; কারণ বিশ্বাতীত যে-পরম বস্তু তাহা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, ঈশ্বরের যোগমায়ার দ্বারা ইহজগতেই দেশ-কালের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বাতীত সত্তায় "এক সঙ্গে থাকা" (Co-existence)

আধ্যাত্মিক, তাহা দেশ বা কালের অনুযায়ী "এক সঙ্গে থাকা" নহে, সেখানে অধ্যাত্ম ঐক্য ও মিলনই ভিত্তি। কিন্তু অন্য পক্ষে, ব্যক্ত জগতে পরম অব্যক্ত বিশ্বাতীত সত্তা কর্ত্তৃক বিশ্ব দেশ ও কালের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে, সেই বিস্তারে তিনি প্রথমে আত্মা-রূপে আবির্ভূত হন এবং সকলকে ধারণ করেন,—ভূতভৃৎ, তাঁহার সর্ব্বব্যাপী আত্মসত্তায় সর্ব্বভূতকে ধরিয়া থাকেন। এমন কি ইহাও বলা যাইতে পারে যে, পরমাত্মাই এই বিশ্বব্যাপী আত্মার ভিতর দিয়া বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছেন; তিনি ইহার অদৃশ্য অধ্যাত্ম ভিত্তি এবং সর্ব্বভূতের আবির্ভাবের গুপ্ত অধ্যাত্ম কারণ। আমাদের মধ্যে গুপ্ত আত্মা যেমন আমাদের চিন্তা, কর্ম্ম, গতিকে ধরিয়া রহিয়াছে, সেইভাবে তিনিও বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছেন। উপলব্ধি হয় যে, তিনি মন, প্রাণ দেহে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহার উপ-স্থিতির দ্বারা তাহাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু এই যে ব্যাপ্তি ইহা চৈতন্যের একটা ক্রিয়া, ইহা জড় বস্তুর ব্যাপ্তি নহে; এই জড় শরীর ও আত্মার চৈতন্যের একটা নিত্য ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই দিব্য আত্মা সর্ব্বভূতকে ধরিয়া রহিয়াছে, সব তাহার মধ্যে অবস্থিত, মূলতঃ জড়ভাবে নহে, কিন্তু আত্মা অধ্যাত্ম-ভাবে যে নিজেকে বিস্তৃত করিয়াছে তাহারই মধ্যে সকলে অবস্থিত। ঐ অধ্যাত্ম-বিস্তৃতিকে আমাদের জড়ানুগত মন ও ইন্দ্রিয় যে ভাবে দেখে তাহাই জড়জগতে বিস্তৃত দেশ ও কাল। বস্তুতঃ এখানেও সবই অধ্যাত্মভাবে পাশাপাশি, এক হইয়া বা মিলিত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ইহা মূল সত্য,—যতক্ষণ না আমরা সেই পরা চৈতন্যে ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি, ততক্ষণ এ সত্য

আমরা প্রয়োগ করিতে পারি না। ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা কেবল আমাদের মনের একটা ধারণা মাত্র হইয়া থাকিবে, কিন্তু, বাস্তব উপলব্ধিতে ইহার অনুরূপ আমরা কিছুই পাইব না। অতএব এই সব দেশ-কাল-বাচক শব্দ ব্যবহার করিয়াই আমাদিগকে বলিতে হয় যে, ওই বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল বস্তু স্বপ্রতিষ্ঠ ভাগবত সত্তার মধ্যে রহিয়াছে, যেমন অন্য সকল জিনিষ আকাশের মধ্যে রাইয়াছে। তাই গুরু এখানে অর্জ্জুনকে বলিলেন "যেমন মহান্ সর্ব্বত্রগামী বায়ু আকাশে অবস্থিত, ভূতগণও সেইরূপ আমাতে অবস্থিত, এই ভাবেই তোমাকে ইহা ধারণা করিতে হইবে।"* বিশ্বসত্তা সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত, এবং স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাও সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত; কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ অনন্ত হইতেছে অচল, স্থির, অক্ষর, আর বিশ্বসত্তা হইতেছে সর্ব্বব্যাপী গতি,—সর্ব্বত্রগঃ। আত্মা এক ভিন্ন বহু নহে; কিন্তু বিশ্বসত্তা সর্ব্বভূতরূপে নিজেকে প্রকট করিতেছে এবং মনে হয় যে, উহা সর্ব্বভূতেরই সমষ্টি। একটি হইতেছে সত্তা, অপরটি সত্তার শক্তি, তাহা সর্ব্বমূল সর্ব্বাধার অক্ষর আত্মার সত্তায় চলিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে। আত্মা এই সকল সৃষ্ট বস্তুতে বা তাহাদের কোন একটিতে অবস্থান করে না, অর্থাৎ, তাহাদের কোন একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে,—ঠিক যেমন এখানে আকাশ কোন রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, যদিও সকল রূপ শেষ পর্য্যন্ত আকাশ হইতেই উৎপন্ন। সকল বস্তুকে একত্র করিলেও ভগবান হয় না বা ভগবানকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, যেমন সর্ব্বত্রগ বায়ুর

* যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ু সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৯।৬

মধ্যে আকাশ সীমাবদ্ধ নহে অথবা ঐ বায়ুর রূপ ও শক্তি সকলকে একত্র করিলেও আকাশ হয় না। তথাপি ঐ গতির মধ্যেও ভগবান রহিয়াছেন; তিনি বহুর মধ্যে অবস্থান করিতেছেন প্রত্যেক জীবের ঈশ্বর রূপে। তাঁহার পক্ষে এই দুই প্রকার সম্বন্ধই একই সঙ্গে সত্য। একটি হইতেছে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মসত্তার সহিত বিশ্বলীলার সম্বন্ধ, অপরটি অনুস্যূতি, বিশ্বসত্তার সহিত বিশ্বসত্তার নিজেরই বিভিন্ন রূপের সম্বন্ধ। একটি সত্য হইতেছে সত্তার, তাহা স্বপ্রতিষ্ঠ, নিজের অক্ষরতায় সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে, অপর সত্যটী হইতেছে সেই সত্তারই শক্তির, তাহা সত্তারই আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশ-লীলাকে উদ্ভাসিত ও পরিচালিত করিয়া প্রকট হইতেছে।

পরাৎপর ভগবান বিশ্বসত্তার ঊর্দ্ধ হইতে নিজের প্রকৃতির উপর চাপ দেন, তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু এককালে ব্যক্ত হইয়া আবার অব্যক্ত হইয়াছে সে-সবকে এক অনন্ত ঘূর্ণায়মান চক্রে পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট করেন*। বিশ্বমাঝে সকল সৃষ্ট বস্তু এই সৃষ্টীক্রিয়ার দ্বারা অবশ হইয়া চালিত হয়,—জগতের যে-সব নিয়ম সর্ব্বভূতরূপে প্রকট ভাগবত সত্তার বিশ্বলীলার ছন্দ প্রকাশ করিতেছে—সকল সৃষ্ট বস্তু সেই সব নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয়। এই দিব্যপ্রকৃতির লীলাতেই জীব তাহার যাতায়াতের চক্র অনুসরণ করে,—প্রকৃতিম্ মামিকাম,

---

* প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥৯।৮

স্বাম্ প্রকৃতিম্। প্রকৃতির বিকাশের নিয়মানুসারে জীব কখনও এক রূপ, কখনও অন্য রূপ গ্রহণ করে; দিব্য প্রকৃতিরই একটা আবির্ভাব রূপে জীবের সত্তার যাহা ধর্ম্ম, জীব সকল সময়েই সেই স্বধর্ম্মের রেখা অনুসরণ করিয়া চলে, প্রকৃতির ঊর্দ্ধতন সাক্ষাৎ লীলাতেই হউক বা অধস্তন পরোক্ষ লীলাতেই হউক, অজ্ঞানেই হউক বা জ্ঞানেই হউক; কল্পের অন্তে জীব প্রকৃতির কর্ম্মলীলা হইতে তাহার অচলতা ও নীরবতার মধ্যে ফিরিয়া যায়। জীব যখন অজ্ঞান, তখন সে প্রকৃতির কল্পচক্রের অধীন, নিজে নিজের প্রভূ নহে, কিন্তু প্রকৃতির বশে পরিচালিত,—অবশং প্রকতের্বশাৎ। কেবল দিব্য-চৈতন্যে ফিরিয়া গিয়াই জীব ঈশ্বরত্ব ও মুক্তি লাভ করিতে পারে। ভগবানও ঐ কল্প চক্রের অনুসরণ করেন, কিন্তু উহার বশে নহে, উহার প্রকাশক ও পরিচালক আত্মা রূপে, তাঁহার সমগ্র সত্তা উহাতে নিয়োজিত হয় না, কিন্তু তাঁহার সত্তার শক্তির দ্বারা তিনি উহাকে অনুসরণ করেন, পরিচালিত করেন। প্রকৃতির মধ্য দিয়া তাঁহার যে কর্ম্ম চলিতেছে সে কর্ম্মের তিনিই অধ্যক্ষ,—তিনি প্রকৃতির মধ্যে সঞ্জাত কোন সত্তা নহেন, কিন্তু তিনি সেই সত্তা যিনি অধ্যাত্ম সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে প্রকৃতিকে সচরাচর বিশ্ব প্রসব করান।‡ তাঁহার শক্তিতে তিনি প্রকৃতির কর্ম্ম অনুসরণ করেন এবং তাঁহার সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হন বটে, কিন্তু তিনি আবার প্রকৃতির বাহিরেও বটেন, যেন প্রকৃতির বিশ্বলীলার উপরে বিশ্বাতীত ঐশ্বরিক সত্তায়

‡ ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥৯।১০

অধিষ্ঠিত থাকেন, কোন বন্ধনহেতু অবশকারী বাসনার দ্বারা তিনি প্রকৃতিতে আসক্ত নহেন, অতএব তাহার কর্ম্মসকলের দ্বারা বদ্ধ নহেন, কারণ তিনি সে-সব অপেক্ষা অনন্তগুণে বড় এবং সে-সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী, কালের চক্রে যে-সব কর্ম্মপরম্পরা চলিতেছে, তাহাদের পূর্ব্বে, তাহাদের সমকালে এবং তাহাদের পরেও তিনি যেমন আছেন ঠিক তেমনই থাকেন।* তাহাদের সকল পরিবর্ত্তনে তাঁহার অক্ষর সত্তার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। যে নীরব অধ্যাত্ম ত্তা বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াছে—তাহা শ্বর কোন পরিবর্ত্তনেই বিচলিত হয় না; কারণ যদিও উহা ধরিয়া রহিয়াছে, তথাপি উহা ঐ পরিবর্ত্তনের লীলায় যোগদান করে না। এই মহত্তম পরাৎপর বিশ্বাতীত সত্তাও সে-সকলের দ্বারা বিচলিত হয় না, কারণ, ইহা তাহাদের অতীত, চিরকাল তাহাদের উপরে রহিয়াছে।

কিন্তু আবার যেহেতু এই কর্ম্ম দিব্য-প্রকৃতির কর্ম্ম,—স্বাম্ প্রকৃতিম্, এবং দিব্য-প্রকৃতি কখনও ভগবান হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না, দিব্য-প্রকৃতি যাহাই সৃষ্টি করুক না কেন তাহার মধ্যে নিশ্চয় ভগবান অনুস্যূত আছেন। এই যে সম্বন্ধ ইহাই ভগবানের সত্তার সমগ্র সত্য নহে, কিন্তু আবার এই সত্যকে আমরা আদৌ অবহেলাও করিতে পারি না। তিনি মানবদেহের

* ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥৯।৯

মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন*। যাহারা এখানে ভাগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, মানব-দেহের মধ্যে ভাগবত সত্তা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে যাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, তাহারা প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্যের দ্বারা বিমূঢ় ও প্রতারিত হয়, তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না যে, অন্তরের মধ্যে ভগবান গুপ্ত রহিয়াছেন, অবতারে তিনি সজ্ঞানে মানবদেহ ধারণ করেন, সাধারন মানুষে তিনি তাঁহার মায়ার দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকেন। যাঁহারা মহাত্মা, যাঁহারা অহংভাবের মধ্যে আবদ্ধ নহেন, যাহারা অন্তর্যামী ভগবানের দিকে নিজেদিগকে খুলিয়া ধরিতে পারেন তাঁহারা জানেন যে, মানুষের মধ্যে যে গুপ্ত আত্মা অপূর্ণ মানবীয় প্রকৃতিতে আবদ্ধ বলিয়া মনে হয়, তাহা সেই একই অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি যাহাকে আমরা সকলের উপরে পরাৎপর ভগবান বলিয়া পূজা করি। যেখানে তিনি সর্ব্বভূতের অধিপতি ও ঈশ্বর ভগবানের সেই পরম পদ তাঁহারা জানেন; অথচ তাহারা দেখিতে পান যে, প্রত্যেক ভূতের মধ্যেও তিনি সেই পরাৎপর দেবতা এবং অন্তর্যামী ভগবান। বাকী যাহা কিছু সে-সবই বিশ্বমাঝে প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য বিকাশের জন্য ভগবানের খণ্ড প্রকাশ, ভগবান নিজে নিজেকে খণ্ডিত করেন। তাঁহারা আরও দেখিতে পান যে,

* অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্ ॥৯।১১
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥৯।১৩

তাঁহারই প্রকৃতি বিশ্বে যাহা কিছু আছে সব হইয়াছে, সুতরাং ইহসংসারে প্রত্যেক বস্তুই মূলতঃ ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নহে, —বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, এবং তাঁহারা যে তাঁহাকে কেবল বিশ্বাতীত পরাৎপর ভগবান বলিয়া পূজা করেন শুধু তাহাই নহে, কিন্তু ইহসংসারে, তাহার একত্বে এবং প্রত্যেক পৃথক সত্তায় তাঁহাকে পূজা করেন ‡। তাঁহারা এই সত্য দর্শন করেন এবং এই সত্যকে অনুসরণ করিয়া তাঁহারা জীবন যাপন করেন, কর্ম্ম করেন; তাঁহাকেই তাঁহারা উপাসনা কবেন, জীবনে অনুসরণ করেন, সকল বস্তুর উর্দ্ধে অবস্থিত সত্তা রূপে, আবার বিশ্ব-মাঝে অবস্থিত ভগবান রূপে, এই দুই রূপেই, তাঁহার পূজা করেন, কর্ম্মযজ্ঞের দ্বারা তাঁহাকে সেবা করেন, জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে সন্ধান করেন, সর্ব্বত্র ভগবান ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না, এবং তাঁহাদের আত্মা এবং অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি সহ সমগ্র সত্তাকে তাঁহার দিকে তুলিয়া ধরেন। এইটিকেই তাঁহারা উদার ও প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া জানেন; কারণ এইটীই পরাৎপর বিশ্বব্যাপী এবং ব্যষ্টিগত ভগবান সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত পন্থা।

‡ জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥৯।১৫
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৯।৩৪

কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান

ইহাই তাহা হইলে সমগ্র সত্য, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও প্রশস্ত জ্ঞান। ভগবান বিশ্বাতীত, সনাতন পরব্রহ্ম,—তাঁহার নিজেরই সত্তা ও প্রকৃতি যে দেশ ও কালের মধ্যে এই বিশ্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, সে সবকে তিনি তাঁহার দেশ ও কালের অতীত প্রতিষ্ঠার দ্বারা ধরিয়া রহিয়াছেন। তিনি পরমাত্মা, বিশ্বের সকল নামরূপ ও গতিধারার আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি পুরুষোত্তম, এই বিশ্বের বা অন্য সকল বিশ্বের সকল আত্মা ও প্রকৃতি, সকল সত্তা ও বিকাশ তাঁহারই আত্মরূপায়ণ ও আত্মশক্তি-প্রকাশ। তিনি পরমেশ্বর, সকল বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় প্রভূ, তিনি তাঁহার নিজের ব্যক্ত শক্তিকে অধ্যাত্মভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জগৎচক্র প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, এবং জগতে সর্ব্বভূতের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ সাধন করিতেছেন। তাঁহা হইতেই জীব এখানে এই জগৎচক্রে আসিয়াছে,—জীব ব্যষ্টিগত অধ্যাত্মসত্তা, প্রকৃতিস্থ পুরুষ; তাঁহারই সত্তায় জীবের অস্তিত্ব, তাঁহারই চেতনার আলোকে জীব সচেতন, তাঁহারই ইচ্ছা ও শক্তি দ্বারা জীব জ্ঞানের, ইচ্ছার, কর্ম্মের ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারই বিশ্বলীলার দিব্য আনন্দে জীব জীবনকে উপভোগ করিতেছে।

মানুষের অন্তরের আত্মা হইতেছে এখানে ভগবানের আংশিক আত্মপ্রকাশ, জগতে তাঁহার প্রকৃতির কার্য্যের জন্য তিনি নিজেকে এইভাবে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, প্রকৃতিঃ জীবভূতাঃ। ব্যষ্টিগত মানুষ তাহার মূল অধ্যাত্ম সত্তায় ভগবানের সহিত এক। দিব্য

প্রকৃতির ক্রিয়ায় সে ভগবানের সহিত এক, অথচ কার্য্যতঃ একটা ভেদ আছে, এবং প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত ভগবান ও বিশ্বপ্রকৃতির ঊর্দ্ধে অবস্থিত ভগবান এতদুভয়ের মধ্যে অনেক প্রকার সম্বন্ধ আছে। প্রকৃতির নীচের খেলায় অজ্ঞান ও অহঙ্কারমূলক ভেদনীতির বশে মনে হয় যেন মানুষ সেই এক ভগবান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এবং এই ভেদ চেতনার মধ্যে থাকিয়াই সে চিন্তা করে, ইচ্ছা করে, কর্ম্ম করে, ভোগ করে, নিজের ক্ষুদ্র অহংয়ের তৃপ্তির জন্য, জগতে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন এবং অন্যান্য মানুষের সহিত নিজের বাহ্যিক সম্বন্ধের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য। কিন্তু বস্তুতঃ তাহার সমস্ত সত্তা, সমস্ত চিন্তা, তাহার সমস্ত ইচ্ছা ও কর্ম্ম ও আনন্দভোগ এ-সবই ভগবানের সত্তার, ভগবানের চিন্তা, ইচ্ছা, কর্ম্ম ও প্রকৃতি-উপভোগের প্রতিচ্ছায়া, যতক্ষণ সে অজ্ঞানের মধ্যে বাস করে ততক্ষণ অহঙ্কারের দ্বারা খণ্ডিত ও বিকৃত। তাহার নিজের এই সত্যে ফিরিয়া যাওয়াই তাহার মুক্তিলাভের সোজা পথ, অজ্ঞানের অধীনতা হইতে পরিত্রাণ পাইবার সর্ব্বাপেক্ষা নিকট ও প্রশস্ত দ্বার। মানুষ প্রকৃতিযুক্ত আত্মা, এবং তাহার প্রকৃতিতে রহিয়াছে মন ও বুদ্ধি, ইচ্ছা ও কর্ম্ম, চিত্তাবেগ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং জীবনের আনন্দ উপভোগ করিবার নিমিত্ত প্রাণের আকাঙ্খা; সুতরাং এই সকল শক্তিকে ভগবদভিমুখী করিয়াই তাহার নিজের উচ্চতম সত্যে ফিরিয়া যাওয়া সম্পূর্ণভাবে সম্ভব করা যাইতে পারে। পরম আত্মা ও ব্রহ্মের জ্ঞান তাহাকে লাভ করিতে হইবে; তাহার প্রেম ও ভক্তিকে পরমপুরুষের দিকেই ফিরাইতে হইবে; তাহার ইচ্ছা ও কর্ম্মকে পরম জগদীশ্বরের অধীন করিতে হইবে। তখন সে নীচের প্রকৃতি হইতে দিব্য প্রকৃতিতে উঠিয়া যাইতে পারিবে, তখন সে তাহার

অজ্ঞানের চিন্তা, ইচ্ছা ও কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া ভগবানের সহিত ঐক্যে, সেই এক আত্মারই আত্মা, শক্তি, জ্যোতি হইয়া চিন্তা করিতে, ইচ্ছা করিতে কর্ম্ম করিতে পারিবে; তখন সে ভিতরে ভগবানের সমস্ত অনন্ততা উপভোগ করিবে, আর তাহাকে কেবল এই সব বাহিরের স্পর্শ, ছদ্মবেশ ও বাহ্যরূপের ভোগ লইয়াই থাকিতে হইবে না। এইরূপে দিব্য জীবন যাপন করিয়া, এইরূপে তাহার সমগ্র আত্মা, সত্তা ও প্রকৃতিকে ভগবদভিমুখী করিয়া, সে পরমব্রহ্মের সত্যতম সত্যের মধ্যে গৃহীত হইবে।

বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, বাসুদেবই সব, ইহা জানা এবং এই জ্ঞানের মধ্যে বাস করা, ইহাই নিগূঢ় রহস্য। সে জানে যে, তিনি আত্মা, অক্ষর, আধাররূপে সকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন আবার সকল জিনিষের মধ্যেই অনুস্যূত রহিয়াছেন। নীচের প্রকৃতির বিশৃঙ্খল ও অশান্ত খেলা হইতে সরিয়া আসিয়া সে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মার নিস্তব্ধতা এবং অবিচ্ছেদ্য শান্তি ও জ্যোতির মধ্যে বাস করে। সে সেখানে ভগবানের এই আত্মার সহিত নিত্য ঐক্য উপলব্ধি করে,—সে আত্মা সর্ব্বভূতের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং জগতের সকল গতি, ক্রিয়া ও ব্যাপারকে ধরিয়া রহিয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতের ভিত্তি স্বরূপ এই যে সনাতন অপরিবর্ত্তনশীল অধ্যাত্ম সত্তা, ইহা হইতে সে উপরে মহত্তর সনাতন, বিশ্বাতীত, পরম সত্য বস্তুর দিকে চাহিয়া দেখে। সে জানে যে, যাহা কিছু আছে সে-সবেরই মধ্যে তিনি দিব্য অধিবাসী, মানুষের হৃদ্দেশে তিনি গুহ্য ঈশ্বররূপে বর্ত্তমান, এবং তাহার প্রাকৃত সত্তা ও এই অভ্যন্তরীন অধ্যাত্ম প্রভুর মধ্যে যে মায়ার আবরণ রহিয়াছে সে সেই আবরণকে অপসৃত করিয়া কর্ম্মকে দেয়। সে তাহার ইচ্ছা চিন্তা, কর্ম্মকে জানে ঈশ্বরের ইচ্ছা, চিন্তা, ও কর্ম্মের

সহিত এক করিয়া দেয়, অন্তর্যামী ভগবানকে সে সকল সময় অনুভব করে এবং তাহার সমস্ত ইচ্ছা, চিন্তা, কর্ম্ম সেই নিত্য ভগবদনুভূতির সহিত এক স্থরে বাঁধা হইয়া যায়, সকলের মধ্যে সে ভগবানকে দেখে ও ভজনা করে, এবং সমস্ত মানবীয় কর্ম্মকে দিব্য প্রকৃতির উচ্চতম আদর্শে রূপান্তরিত করে। সে জানে যে, বিশ্বজগতে তাহার চারিদিকে যাহা কিছু রহিয়াছে সে-সবের মূল ও সার সত্তা তিনি—সংসারের সমস্ত জিনিষকে সে দেখে যে, তাহাদের বাহ্যরূপে সে সব হইতেছে Veils—ছদ্মবেশ, আবার সেই সঙ্গেই দেখে যে, তাহাদের নিগূঢ় মর্ম্মে তাহারা হইতেছে সেই এক অচিন্ত্য সত্যবস্তুর আত্মপ্রকাশের উপলক্ষ্য ও উপায় ; যে ঐক্য, ব্রহ্ম, পুরুষ, আত্মা, বাস্থদেব, যে-সত্তা এই সর্ব্বভূত হইয়াছে, সে সর্ব্বত্র তাহাকে দেখিতে পায়। সেই জন্যই তাহার সমগ্র অভ্যন্তরীন জীবন অনন্তের সহিত এক স্থরে ও ছন্দে গাঁথা হইয়া যায়, সে-অনন্ত তখন হয় সকল জীবে, তাহার ভিতরে ও চতুর্পার্শ্বে সকল বস্তুতে স্বপ্রকাশ, এবং তাহার সমগ্র বাহ্য জীবন বিশ্ব-উদ্দেশ্য সাধনের বিশুদ্ধ যন্ত্রে পরিণত হয়। অন্তরাত্মার ভিতর দিয়া উপরে সে সেই পরব্রহ্মের দিকে চাহিয়া দেখে, যিনি এখানে এবং সেখানে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থিত ঈশ্বরের ভিতর দিয়া উপরে সে সেই পরম পুরুষের দিকে চাহিয়া দেখে যিনি তাঁহার উচ্চতম প্রতিষ্ঠায় সকল আবাসের উপরে। বিশ্বমাঝে যে-ঈশ্বর আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহার ভিতর দিয়া উপরে সেই পরমেশ্বরের দিকে সে চাহিয়া দেখে যিনি তাঁহার সকল সৃষ্টি, সকল প্রকাশের উপরে থাকিয়া সবকে পরিচালিত করিতেছেন। এইরূপে জ্ঞানের সীমাহীন বিকাশ এবং উর্দ্ধমুখী দৃষ্টি ও আস্পৃহার (aspiration) ভিতর দিয়া সে তাহাতেই উঠিয়া যায় যাহাকে

সে একান্ত সমগ্রভাব, সর্ব্বভাবেন, ভজনা করিয়াছে।

এই যে জীবের সমগ্রভাবে ভগবদভিমুখী হওয়া, ইহাকেই গীতা জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়ের মহান্ ভিত্তি করিয়াছে। ভগবানকে এইরূপ সমগ্রভাবে জানার অর্থ, আত্মায়, সমস্ত জগতে এবং সমস্ত জগতের অতীতে, তাঁহাকে এক বলিয়া জানা,—জানা যে, ভগবান একই সঙ্গে এই সবই। অথচ শুধু আবার এই ভাবে জানাই যথেষ্ট নহে, যদি সেই সঙ্গেই হৃদয় ও আত্মাকে প্রগাঢ়ভাবে ভগবানের দিকে তুলিয়া ধরা না হয়, যদি তাহা একাগ্র এবং সেই সঙ্গেই সর্ব্বতোমুখী প্রেম, ভক্তি, আস্পৃহাকে উদ্বুদ্ধ না করে। বস্তুতঃ যে জ্ঞানের সঙ্গে আস্পৃহা নাই, যাহা হৃদয়ের ঊর্দ্ধমুখীভাবের দ্বারা সঞ্জীবিত নহে, তাহা সত্য জ্ঞান নহে, তাহা কেবল তর্কবুদ্ধির খেলা, শুষ্ক বিচারের নিষ্ফল প্রয়াস। ভগবানের দর্শন প্রকৃতভাবে লাভ করিলে তাহা নিশ্চয়ই ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং ভগবানকে পাইবার জন্য তীব্র আবেগ আনিয়া দেয়,—ভগবানের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার প্রতি, আবার আমাদের মধ্যে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহারও প্রতি গাঢ় অনুরাগ আনিয়া দেয়। বুদ্ধি দ্বারা জানা মানে, শুধু বুঝা; এইভাবে আরম্ভ করা কার্য্যকরী হইতে পারে, আবার নাও হইতে পারে,—কার্য্যকরী হইবেই না যদি ঐ জানার মধ্যে কোন আন্তরিকতা না থাকে, অভ্যন্তরীন উপলব্ধি লাভের জন্য ইচ্ছার কোনও অনুপ্রেরণা না থাকে, ভিতরের সত্তার উপর কোনও প্রভাব না হয়, আত্মায় কোনও সাড়া না আসে; কারণ তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, মস্তিষ্ক বাহ্যিকভাবে বুঝিয়াছে কিন্তু আত্মা অভ্যন্তরীন ভাবে কিছুই দেখি নাই। সত্য জ্ঞান হইতেছে ভিতরের সত্তার দ্বারা জানা, এবং যখন ঐ ভিতরের সত্তায় আলোকের স্পর্শ লাগে,

তখন সে যাহা দেখে সেটিকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হয়, সেটিকে লাভ করিতে বাসনা করে, সেটিকে নিজের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে এবং নিজে তাহাতে গড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করে, যে-সত্যের মহিমা সে দর্শন করিয়াছে তাহার সহিত এক হইয়া যাইবার জন্য সাধনা করে। এইরূপ জ্ঞানের অর্থ হইতেছে, একাত্মতার উপলব্ধি; আর ঐ ভিতরের সত্তা নিজেকে পূর্ণ করিয়া তোলে চৈতন্য ও আনন্দের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, নিজের যাহাই সে দর্শন করিয়াছে তাহাকে লাভ করিয়া তাহার সহিত ঐক্যের দ্বারা, সুতরাং এই জ্ঞান যখনই জাগিয়া উঠে তখনই তাহা এই সত্য ও একমাত্র পরিপূর্ণ সিদ্ধি-লাভের অদম্য প্রেরণা নিশ্চয়ই আনিয়া দেয়। এই জ্ঞানে যাহাকে জানা যায় তাহা বাহ্য বস্তু নহে, তাহা দিব্য পুরুষ; আমরা যাহা কিছু তিনি সেই সবের আত্মা ও ঈশ্বর। তাঁহাতে সমগ্র সত্তার আনন্দ এবং তাঁহার প্রতি গভীর ও প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসা এই জ্ঞানের প্রাণ ও অবশ্যম্ভাবী ফল। এবং এই ভক্তি শুধুই হৃদয়ের কামনা মাত্র নহে, ইহা হইতেছে সমগ্র জীবনের সমর্পণ। অতএব ইহা উৎসর্গের রূপও নিশ্চয়ই গ্রহণ করে; এখানে আছে আমাদের সকল কর্ম্ম ঈশ্বরকে অর্পণ করা, এখানে আছে আমাদের সমগ্র বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ সক্রিয় প্রকৃতিকে সমস্ত ভিতরের খেলায় এবং সমস্ত বাহিরের খেলায় আমাদের ভক্তির পাত্র ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গ করা। আমাদের অন্তরের সমস্ত ক্রিয়া তাঁহারই মধ্যে চলিতে থাকে, সে-সব তাঁহাকে সেই ঈশ্বর ও আত্মাকেই, তাঁহাদের শক্তির ও প্রচেষ্টার মূল উৎস ও লক্ষ্যরূপে সন্ধান করে। আমাদের বাহিরের সমস্ত ক্রিয়া জগতের মধ্যে অবস্থিত তাঁহার দিকেই প্রসারিত হয়, জগতের মধ্যেই ভগবানের সেবার আয়োজন

করে, সে-সেবা ও কর্ম্মের নিয়ামক শক্তি হইতেছেন আমাদের অন্তরস্থিত ভগবান, তাঁহাতেই আমরা বিশ্ব ও বিশ্বের সকল জীবের সহিত এক আত্মা। কারণ জগৎ ও আত্মা, প্রকৃতি এবং তাহার মধ্যে স্থিত জীব উভয়েই সেই একমেবাদ্বিতীয়মের চৈতন্যের দ্বারা উদ্ভাসিত, উভয়েই সেই বিশ্বাতীত পুরুষোত্তমের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শরীর। এই ভাবে সেই এক আত্মার মধ্যে মন, হৃদয় ও ইচ্ছার সমন্বয় হয় এবং সেই সঙ্গে এই সমগ্র মিলনে, এই সর্ব্বতোমুখী ভগবদুপলব্ধিতে, এই দিব্য যোগে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় হয়।

কিন্তু এই দিব্য যোগের সাধনা আরম্ভ করাও অহং-ভাবে বদ্ধ জীবের পক্ষে কঠিন—শুধু তাহাই নহে, যাহারা আবার শেষ পর্য্যন্ত আর সব ছাড়িয়া চিরকালের মত এই যোগের পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের পক্ষেও ইহার পূর্ণ সার্থকতা ও সামঞ্জস্যে পৌছান সহজ নহে—মর্ত্ত্য মানুষের মন অজ্ঞানের বশে ছায়া ও বাহ্যরূপের উপর নির্ভর করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে; ইহা শুধু মানুষের বাহ্যিক শরীর, বাহ্যিক মন, বাহ্যিক জীবনধারাকেই দেখে কিন্তু জীবের মধ্যে যে দেবতা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে কোনও মুক্তিপ্রদ দৃষ্টি লাভ করিতে পারে না। নিজেরই মধ্যে যে দেবতা রহিয়াছেন তাঁহাকে সে অগ্রাহ্য করে, এবং অপর মনুষ্যের মধ্যেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না, এবং যদিও ভগবান মানুষের মধ্যে নিজেকে অবতার ও বিভূতিরূপে প্রকাশিত করেন তথাপি সে অন্ধ থাকে এবং মানবরূপের অন্তরালে অবস্থিত ভগবানকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করে, অবজানন্তি মাম্ মূঢ়া

মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।* আর যদি সে জীবন্ত মানুষের মধ্যেই ভগবানকে অগ্রাহ্য করে তাহা হইলে বাহ্যজগতে ভগবানকে দেখা তাহার পক্ষে আরও অসম্ভব হয়। কারণ এই বাহ্যজগৎকে সে দেখে তাহার ভেদাত্মক অহংভাবের কারাগার হইতে, তাহার সীমাবদ্ধ মনের রুদ্ধ গবাক্ষের ভিতর দিয়া। বিশ্বের মধ্যে সে ভগবানকে দেখিতে পায় না; যে পরম ভগবান এই বিচিত্র সৃষ্টিপূর্ণ জগৎসমূহের অধীশ্বর এবং তাহাদের মধ্যে বাস করিতেছেন তাঁহার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না; যে-দৃষ্টির দ্বারা জগতের সকল বস্তু দিব্যভাব প্রাপ্ত হয় এবং জীব নিজের অন্তর্নিহিত দেবত্বে জাগ্রত—হইয়া উঠে এবং ভগবানের হয়, ভগবত্তুল্য হয়, সে-দৃষ্টি সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অন্ধ মানুষের যে অহং ক্ষুদ্র জিনিষের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, শুধু সেই সবকেই পাইতে চাহিতেছে এবং তাহাদের দ্বারা মন, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয়ের পার্থিব ক্ষুধা মিটাইতে চাহিতেছে—সেই অহংয়ের জীবনটীকেই সে সহজে দেখিতে পায় এবং তাহাতে তীব্র ভাবে আসক্ত হইয়া পড়ে। চিত্তের এই বহির্মুখী গতির দিকে যাহারা অতিমাত্রায় সমগ্র ভাবে নিজেদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহারা নীচের প্রকৃতির কবলে পতিত হয়, সেইটীকেই একান্ত ভাবে ধরিয়া থাকে এবং নিজেদের জীবনের ভিত্তি করে। মানুষের মধ্যে যে রাক্ষসী ‡ প্রকৃতি রহিয়াছে তাহারা তাহারই অধীন হইয়া পড়ে, এরূপ মানুষে প্রাণের তাড়নার

---

* অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ গীতা ৯।১১

‡ মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ৯।১২

বশে ইন্দ্রিয়পরায়ণ অহংয়ের উগ্র ও অপরিমিত তৃপ্তির জন্য সব কিছুকেই উৎসর্গ করে এবং সেই অহংকেই তাহার ইচ্ছা, চিন্তা, কর্ম্ম ও ভোগের তমোময় দেবতা করিয়া তোলে। অথবা আসুরী প্রকৃতির দাম্ভিক অহঙ্কার, স্বাভিমানী চিন্তা, স্বার্থপর কর্ম্ম এবং ভোগের আত্মতৃপ্ত অথচ চির-অতৃপ্ত মানসিক ক্ষুধা—এই সবের দ্বারা তাড়িত হইয়া তাহারা বৃথা চক্রে ঘুরিয়া মরে। কিন্তু ভগবান ও আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন এই অহং-চৈতন্যের মধ্যে অবিরত বাস করিতে থাকিলে, এবং ইহাকেই আমাদের সকল কর্ম্মের কেন্দ্র করিয়া তুলিলে—আমরা প্রকৃত আত্ম-জ্ঞানকে একেবারেই ধরিতে পারিব না। আত্মার বিপথগ্রস্ত যন্ত্রগুলির উপর ইহা যে মোহ বিস্তার করে তাহা জীবনকে নিষ্ফল ভাবে ঘুরায়। এই অহং-চৈতন্যের সমস্ত আশা, কর্ম্ম, জ্ঞানকে যখন দিব্য ও সনাতন আদর্শের তুলনায় বিচার করা যায় তখন সে-সব শূন্য, ব্যর্থ বলিয়া প্রতীত হয়, কারণ ইহা মহত্তর আশার পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়, মুক্তিপ্রদ কর্ম্মকে বহিষ্কার করে, সত্য জ্ঞানের আলোককে নির্ব্বাসিত করে। এই জ্ঞান শুধু বাহ্যদৃশ্য দেখে কিন্তু ভিতরের সত্যকে দেখে না অতএব ইহা মিথ্যা জ্ঞান, এই আশা অনিত্যের পশ্চাতে ছুটে কিন্তু নিত্য বস্তুর সন্ধান করে না অতএব ইহা মিথ্যা আশা, ক্ষতির দ্বারা এই কর্ম্মের সমস্ত লাভ নষ্ট হইয়া যায় অতএব এই কর্ম্ম অন্তহীন পণ্ডশ্রম।

মানুষের পক্ষে যে উচ্চতর দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করা সম্ভব সেই দৈবী প্রকৃতির আলোক ও বিশালতার অভিমুখে যে-সব মহাত্মারা নিজেদিগকে খুলিয়া ধরেন কেবল তাঁহারাই মুক্তি ও পূর্ণ সিদ্ধি লাভের পথে উঠিয়াছেন, সে-পথ প্রথমে সঙ্কীর্ণ কিন্তু

পরিশেষে এমনই প্রশস্ত যে ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না *। মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ, ইহাই মানুষের প্রকৃত কাজ; এই আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত দৈবী প্রকৃতির দিকে ফিরান, ইহাই মানবজীবনের সুরক্ষিত গুপ্ত রহস্য। এই দেবত্ব যতই পরিবর্দ্ধিত হয়, ততই মায়ার আবরণ খসিয়া পড়ে এবং জীব কর্ম্মের মহত্তর সার্থকতা এবং জীবনের প্রকৃত সত্য দেখিতে পায়। মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রতি, জগতের মধ্যে ভগবানের প্রতি দৃষ্টি তখন খুলিয়া যায়; সেই দৃষ্টি অন্তরের দিক দিয়া দেখে ও বাহিরের দিক দিয়া জানে সেই অসীম আত্মাকে, সেই অবিনাশী সত্তাকে যাঁহা হইতে সকল সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে, যিনি সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন এবং যাঁহার মধ্যে ও যাঁহার দ্বারা সব-কিছুই নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে। অতএব যখন এই দৃষ্টি, এই জ্ঞান মানবাত্মাকে অধিকার করে, তখন, তাহার জীবনের সমস্ত আস্পৃহা ভগবান ও অনন্তের প্রতি সর্ব্বাতিরেকী প্রেম এবং অপরিসীম ভক্তিতে পরিণত হয়। সেই নিত্য, সনাতন, অধ্যাত্ম, জীবন্ত, বিশ্বব্যাপী সত্য বস্তুতে মন অনন্য ভাবে আসক্ত হয়, সেই সত্য বস্তু ছাড়া তাহার কাছে আর কোন জিনিষেরই কোনও মূল্য থাকে না, একমাত্র সেই সর্ব্বানন্দময় পরম পুরুষেই সে পরম প্রীতি লাভ করে। যে সর্ব্বব্যাপী মহত্ত্ব, জ্যোতি, সৌন্দর্য্য, শক্তি ও সত্য আপন মহিমায় আপনাকে মানবাত্মার নিকটে প্রকাশিত করিয়াছে, তাঁহার গুণকীর্ত্তন করা এবং সেই

---

* মহাত্মনাস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ৯।১৩

পরম আত্মা ও অনন্ত পুরুষের উপাসনা করা, ইহাই হয় তখন সকল বাক্য, সকল চিন্তার একান্ত লক্ষ্য *। ভিতরের সত্তা সকল আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য এত কাল যে চেষ্টা করিয়াছে এখন সে-সব চেষ্টা অন্তরাত্মায় ভগবানকে পাইবার এবং প্রকৃতিতে ভাগবত ভাব বিকাশ করিবার অধ্যাত্ম সাধনা ও আস্পৃগাতে পরিণত হয়। সমস্ত জীবন হয় সেই ভগবানের সহিত এই মানবাত্মার নিত্যযোগ ও মিলন। ইহাই পূর্ণভক্তির ধারা ; নিবেদিত হৃদয়ের উৎসর্গের দ্বারা উহা আমাদের সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতিকে নিত্য সনাতন পুরুষোত্তমের দিকে উহা একাগ্রভাবে তুলিয়া দেয়।

যাঁহারা জ্ঞানের উপরেই বেশী ঝোঁক দেন তাঁহারাও তাঁহাদের আত্মা ও প্রকৃতির উপর ভগবদ্ জ্ঞান, ভগবদ্দর্শনের যে নিত্য-বর্দ্ধন-শীল, সর্ব্বতোমুখী, অনতিক্রম্য প্রভাব তদ্দ্বারা সেই একই স্থানে উপনীত হন †। তাঁহাদের যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ, জ্ঞানের অনির্ব্বচনীয় আনন্দের দ্বারা তাঁহারা পুরুষোত্তমকে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হন, জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে। এই যে ব্যাপক জ্ঞান, সমগ্র সত্তাই ইহার যন্ত্র এবং অখণ্ড সমগ্রতাই ইহার লক্ষ্য। ইহা পরম সত্তাকে কেবল শূন্যময় ঐক্যে কিম্বা সকল সম্বন্ধের অতীত অনির্দ্দেশ্য সত্তারূপে চাওয়া নহে। ইহা হইতেছে সেই পরম ও বিশ্বপুরুষকে হৃদয়াবেগের

---

* সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥৯।১৪

† জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥৯।১৫

সহিত সন্ধান ও লাভ করা, ইহা হইতেছে অনন্তকে তাঁহার অনন্ততায় পাওয়া আবার যাহা কিছু সান্ত আছে সে-সবের মধ্যেও তাঁহাকে পাওয়া, এককে তাঁহার একত্বে দেখা ও আলিঙ্গন করা আবার তাঁহাকে তাহার সকল বিভিন্ন তত্ত্বে, তাঁহার অসংখ্য মূর্ত্তিতে, শক্তিতে, রূপে, এখানে, সেখানে, সর্ব্বত্র, কালাতীত অবস্থায় আবার কালের মধ্যে, বহুধা, তাঁহার ঈশ্বরত্বের অনন্তভাবে, অসংখ্য জীবে তাঁহাকে দেখা ও আলিঙ্গন করা, একত্বেন, পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্। সহজেই এই জ্ঞান হইয়া উঠে উপাসনা, উদার ভক্তি, বিশাল আত্মদান, সমগ্র আত্মসমর্পণ কারণ ইহা হইতেছে এমন এক আত্মার জ্ঞান, এমন সত্তার স্পর্শ, এমন এক পরম ও বিশ্বপুরুষের সহিত আলিঙ্গন, যিনি আমাদের সব-কিছুর উপরেই দাবি রাখেন, আবার আমরা যখন তাঁহার সমীপে যাই তিনি তাঁহার অনন্ত আনন্দলীলার সমস্ত সম্পদ আমাদের উপরে অবিরতধারে ঢালিয়া দেন।

কর্ম্মের পথও ভক্তি ও প্রেমপূর্ব্বক আত্মদানে পরিণত হয় কারণ ইহা হইতেছে আমাদের সকল ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম্ম পূর্ণভাবে সেই এক পুরুষোত্তমের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা। বেদের বাহ্যিক যজ্ঞানুষ্ঠান একটি শক্তিশালী রূপক, ইহার উদ্দেশ্য খুব উচ্চ না হইলেও, তাহা স্বর্গাভিমুখী; কিন্তু প্রকৃত যজ্ঞ হইতেছে ভিতরের, ইহাতে সর্ব্বময় ভগবান নিজেই হন যজ্ঞক্রিয়া, যজ্ঞ এবং যজ্ঞের প্রত্যেক আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান *। সেই অন্তর্যজ্ঞের সমস্ত ক্রিয়া ও রূপ হইতেছে আমাদের মধ্যে তাঁহারই শক্তির আত্মবিধান ও আত্মপ্রকাশ, সেই-যে শক্তি আমাদের আস্পৃহাকে আশ্রয় করিয়া

* অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥৯।১৬

আপন উৎসের দিকে উঠিয়া চলিয়াছে। অন্তর্য্যামী ভগবান নিজেই অগ্নি, নিজেই হব্য, অহমগ্নিরহং হুতম্, কারণ ঐ অগ্নি ভগবদ্মুখী ইচ্ছাশক্তি এবং এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের মধ্যে স্বয়ং ভগবান। আর ভগবানের যে রূপ ও শক্তি উপাদানস্বরূপ আমাদের প্রকৃতি ও সত্তায় বর্ত্তমান, তাহাই অগ্নিতে অর্পিত হব্য; ভগবানের নিকট হইতে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহা সমগ্রভাবেই আপনার সত্তার, আপনার পরম সত্য ও মূলের সেবায় ও পূজায় উৎসর্গ করা হয়। মনীষী ভগবান নিজেই হন পবিত্র মন্ত্র, মন্ত্র ভগবদ্মুখী চিন্তায় প্রকট ভাগবতসত্তারই জ্যোতি, ঐ চিন্তার নিগূঢ় তত্ত্ব-পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় শ্রুতবাক্যে ও মানুষের নিকট প্রকাশিত অনন্তের ছন্দে সেই মন্ত্র সজীব হইয়া উঠে। জ্ঞানময় ভগবান নিজেই বেদ, আবার বেদে যাহা কিছু জানা যায়, বেদ্য, তাহাও তিনি। তিনি জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ই। ঋক্, যজুঃ, সাম, যে জ্ঞানের বাণী মনকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে, যে শক্তির বাণী কর্ম্মকে যথার্থভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, যে শান্তি ও সুসমঞ্জস সিদ্ধির বাণী আত্মার দিব্যবাসনার তৃপ্তি আনিয়া দেয়, এই সবই ব্রহ্ম, সবই ভগবান।* দিব্যচৈতন্যের মন্ত্র জ্ঞানজ্যোতি আনিয়া দেয়, দিব্য শক্তির মন্ত্র কার্য্যকরী ইচ্ছা-শক্তি আনিয়া দেয়, দিব্য আনন্দের মন্ত্র জীবনে অধ্যাত্ম আনন্দের পূর্ণতা আনিয়া দেয়। সকল বাক্য ও চিন্তা মহান্ ওঁ-এরই পরিস্ফুরণ, ওঁ-ই সনাতন বাক্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বস্তুর রূপের মধ্যে প্রকটিত ওঁ, সকল বস্তু ও রূপ যে সৃজনশীল আত্মবিকাশরূপ চৈতন্য লীলার প্রকাশ তাহার মধ্যে প্রকটিত ওঁ, সকলের পশ্চাতে অনন্তের যে

---

* পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেবচ ॥৯।১৭

আত্মসমাহিত পরাচেতন শক্তি তাহার মধ্যে প্রকটিত ওঁ—ওঁ ই সকল বস্তু ও ভাবের, সকল নাম ও রূপের পরম উৎস, বীজ, আশয়,—ইহা নিজেই সমগ্রভাবে পরম স্পর্শাতীত সত্তা, আদি ঐক্য, কালাতীত পরম রহস্য, সকল ব্যক্তজগতের উর্দ্ধে বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে স্বপ্রতিষ্ঠিত *। অতএব এই যে যজ্ঞ, ইহা একই সঙ্গে কর্ম্ম ও ভক্তি ও জ্ঞান।

এইরূপে যে জানে, ভজনা করে, নিজের সমস্ত কর্ম্মকে এক পরম আত্মোৎসর্গে অনন্তের নিকট সমর্পণ করে; তাহার পক্ষে ভগবানই সব, এবং সবই ভগবান। সে ভগবানকে এই জগতের পিতা বলিয়া জানে, তিনি তাঁহার সন্তানগণকে পোষণ করিতেছেন, পালন করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন। সে ভগবানকে জগন্মাতা বলিয়া জানে, যিনি আমাদিগকে তাঁহার বুকের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের উপর তাঁহার প্রেমের মাধুরী অবিরতধারে বর্ষণ করিতেছেন এবং বিশ্বজগৎ তাঁহার দিব্য সৌন্দর্য্যের মুর্ত্তিতে ভরিয়া দিতেছেন। সে ভগবানকে এই জগতের আদি, প্রথম স্রষ্টিকর্ত্তা, পিতামহ বলিয়া জানে; দেশ, কাল ও সম্বন্ধের মধ্যে উৎপাদন ও সৃষ্টি করিতে যাহারা ব্রতী রহিয়াছে তাহারা সকলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূত। সে ভগবানকে সকল বিশ্বগত ও প্রত্যেক ব্যক্তিগত বিধানের ঈশ্বর ও বিধাতা বলিয়া জানে। যে মানুষ নিজেকে অনন্তের নিকট সমর্পণ করিয়াছে, জগৎ বা নিয়তি বা অনিশ্চয় সম্ভাবনা কোন কিছুই তাহাকে আর আতঙ্কিত করিতে

* ওঁ-অ, উ, ম্—অ, বাহ্য ও স্থুলের মূল সত্তা, বিরাট; উ, সূক্ষ্ম অভ্যন্তরীনের মূল সত্তা, তৈজস; ম্ নিগূঢ় পুরাচেতন মহত্ত্বের সত্তা, প্রজ্ঞা; ওঁ,—সর্ব্বাতীত পরম বস্তু, তুরীয়।

—মাণ্ডুক্যোপনিষদ্

পারে না; দুঃখ ও অশুভ দেখিয়া সে আর বিভ্রান্ত হয় না। যাহার দৃষ্টি আছে তাহার পক্ষে ভগবানই পথ এবং ভগবানই গতি, গন্তব্য-স্থল, ✤ সে পথে নিজেকে হারাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই; সেই গন্তব্যের দিকে তাহার সদ্‌বুদ্ধি-পরিচালিত পদক্ষেপ প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে নিশ্চিতভাবেই লইয়া যায়। সে জানে ভগবান তাহার এবং সকলের প্রভু, তাহার প্রকৃতির আধার, প্রাকৃত-জীবের পতি, প্রণয়ী, ভর্ত্তা, তাহার সকল চিন্তা ও কর্ম্মের অন্তর্য্যামী সাক্ষী। ভগবানই তাহার আবাস, তাহার গৃহ ও স্বদেশ, তাহার আশা আকাঙ্ক্ষার আশ্রয়স্থল, সকল জীবের জ্ঞানী অন্তরঙ্গ হিতৈষী বন্ধু। দৃশ্য জগতের সকল সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তাহার দৃষ্টি ও অনুভূতিতে সেই একেরই খেলা; চিরন্তন পুনরাবর্ত্তনলীলায় পুনঃপুনঃ তিনি নিজের আত্মপ্রকাশকে দেশ ও কালে প্রকট করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন আবার প্রত্যাহার করিতেছেন। একমাত্র তিনিই অবিনাশী বীজ, যাহা কিছুর উৎপত্তি ও ধ্বংস হইতেছে বলিয়া মনে হয় তিনি সে-সবের মূল, আবার অব্যক্ত অবস্থায় সে-সব তাঁহার মধ্যেই চির-বিশ্রাম লাভ করে, নিধানং বীজমব্যয়ম্। সূর্য্য ও অগ্নির তাপের ভিতর দিয়া তিনিই উত্তাপ প্রদান করেন; তিনিই বর্ষার প্রাচুর্য্য আবার তিনিই শোষণ; এই জড়প্রকৃতি এবং ইহার সমুদয় ক্রিয়া তিনিই।* মৃত্যু তাঁহার মুখস্, এবং অমৃতত্ব তাঁহার আত্মপ্রকাশ। যাহা কিছু আমরা আছে বলি, সৎ, সে-সবই তিনি, আবার

✤ গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥৯।১৮

* তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥৯।১৯

যাহা কিছু নাই, অসৎ, বলিয়া আমরা মনে করি সে-সবও গুপ্ত-ভাবে অনন্তের মধ্যে বিরাজমান এবং অনির্ব্বচনীয় ভগবানের পরম রহস্যময় সত্তার অংশভূত।

উচ্চতম জ্ঞান ও ভক্তি ব্যতীত, যিনিই সব সেই পরম পুরুষের নিকট পূর্ণ আত্মদান ও সমর্পণ ব্যতীত আর কিছুই আমাদিগকে সেই পরম পুরুষের নিকট লইয়া আসিতে পারিবে না। অন্য ধর্ম্ম, অন্য উপাসনা, অন্য জ্ঞান, অন্য সাধনা সকল সময়েই যথাযথ ফল প্রদান করে, কিন্তু এ-সব ফল ক্ষণস্থায়ী, ভগবানের প্রতীক ও আভাসের উপভোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদের মানসিক অবস্থানুযায়ী সকল সময়েই আমাদের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা আছে, বাহ্যিক জ্ঞান বা অন্তরতম জ্ঞান, বাহ্যিক সাধনা বা নিগূঢ় অন্তরতম সাধনা ; বাহ্যিক ধর্ম্ম হইতেছে বাহিরের কোনও দেবতাকে ভজনা করা এবং বাহ্যিক কোনও সুখময় অবস্থা প্রার্থনা করা ; এই পথের সাধকেরা তাহাদের চরিত্রকে নির্ম্মল পাপশূন্য করে, এবং শাস্ত্রের বাহ্য বিধান পালন করিবার জন্য নৈতিক ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করে ; তাহারা প্রতীক-স্বরূপ বাহ্যিক যোগের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে *। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে পার্থিক জীবনের অনিত্য

---

* ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥৯।২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥৯।২১

নশ্বর সুখ দুঃখের অন্তে স্বর্গলোকের আনন্দলাভ করা, সে-সুখ পৃথিবীর সুখের চেয়ে মহত্তর কিন্তু তথাপি তাহা ব্যক্তিগত ও লৌকিক ভোগ, যদিও সে লোক এই ক্ষুদ্র দুঃখময় পৃথিবীর অপেক্ষা বড়। আর এই যে-ভোগ তাহারা কামনা করে, শ্রদ্ধা ও সদাচারের দ্বারা তাহারা তাহা প্রাপ্ত হয়, কারণ কেবল এই জড়জীবন এবং এই পার্থিব সংসারলীলাই আমাদের ব্যক্তিগত সম্ভাবনার চরম নহে বা বিশ্বজগতের সমগ্র ধারা নহে। অন্যান্য লোক ও জগৎও আছে এবং সে-সব পৃথিবী হইতে আরও বিশালতর সুখের ক্ষেত্র, স্বর্গলোকং বিশালম্। এইরূপে প্রাচীন কালের বৈদিক আনুষ্ঠানিক বেদত্রয়ের বহিরঙ্গ অর্থ আয়ত্ত করিতেন, পাপ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতেন, দেবতাদের সহিত যোগের মদিরা সোম পান করিতেন, এবং যজ্ঞ ও সৎকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গফল প্রার্থনা করিতেন। পরলোকে এই দৃঢ়বিশ্বাস এবং এক দিব্যতর লোকে গমনের আকাঙ্ক্ষা জীবকে এমন শক্তি দেয় যাহার দ্বারা সে মৃত্যুর পর তাহার শ্রদ্ধা ও আকাঙ্ক্ষার একান্ত লক্ষ্য-স্বরূপ স্বর্গের ভোগ লাভ করিতে পারে; কিন্তু আবার এই মর্ত্ত্য জীবনেই তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়, কারণ এই জীবনের যে সত্য লক্ষ্য সেইটির সন্ধান বা সিদ্ধি সে লাভ করিতে পারে নাই। অন্য কোথাও নহে, এইখানেই সর্ব্বোত্তম ভগবানকে লাভ করিতে হইবে, অপূর্ণ জড় মানবীয় প্রকৃতি হইতেই জীবের দিব্য প্রকৃতির বিকাশ করিতে হইবে, এবং ভগবান ও মানব ও বিশ্বের সহিত ঐক্যের ভিতর দিয়া জীবনের সমগ্র বিশাল সত্যকে জানিতে হইবে, সেই সত্য অনুসারে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেন জীবনের মাঝেই তাহার অত্যাশ্চর্য্য প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইভাবেই

আমাদের দীর্ঘ পুনরাবর্ত্তন-চক্রের পরিসমাপ্তি হইবে এবং আমরা এক পরম সিদ্ধির অধিকারী হইব; মানবজন্মে জীবকে এই সুযোগই দেওয়া হইয়াছে এবং যতক্ষণ না ইহা সম্পন্ন হইতেছে ততক্ষণ জন্ম জন্মান্তরের শেষ কিছুতেই হইতে পারে না। বিশ্বজগতে আমাদের জন্মের এই যে চরম প্রয়োজন, তাহার সিদ্ধির জন্য ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি একান্ত প্রেম ও ভক্তির ভিতর দিয়া সর্ব্বদা সেই উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হয়, সেই ভক্তির দ্বারা পরম বিশ্বপুরুষকেই সে তাহার জীবনের সমগ্র লক্ষ্য করে,—এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র অহং এর ভোগ বা স্বর্গভোগকে নহে; পরম বিশ্বপুরুষকেই সে তাহার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত জ্ঞানের সমগ্র লক্ষ্য করে ❋। ভগবান ব্যতীত আর কিছুই না দেখা, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া থাকা, সকল জীবের মধ্যে তাঁহাকে ভালবাসা এবং সকল বস্তুতে তাঁহারই আনন্দ গ্রহণ করা,—ইহাই হয় তাহার অধ্যাত্মজীবনের সমগ্র স্বরূপ। তাহার ভগবদ্দর্শন তাহাকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করে না, অথবা জীবনের পূর্ণতার বিন্দুমাত্র হইতেও সে বঞ্চিত হয় না; কারণ ভগবান আপনা হইতেই তাহাকে সকল কল্যাণ, সকল যোগক্ষেম * আনিয়া দেন, যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। সে যাহা পায়, স্বর্গের সুখ বা পৃথিবীর সুখ তাহার সামান্য ছায়া মাত্র, কারণ সে যেমন ভাগবতভাবে গড়িয়া উঠে, তেমনই ভগবানও তাঁহার অনন্তজীবনের অজস্র জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ লইয়া তাহার মধ্যে নামিয়া আসেন।

❋ অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ৯।২২

* যে-সব বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ নাই তাহাদের প্রাপ্তিকে যোগ বলা যায়, এবং সেই লব্ধ সম্পদ রক্ষাই ক্ষেম।—অনুবাদক

সাধারণ ধর্ম্ম হইতেছে আংশিক দেবগণের পূজা, পূর্ণ ভগবানের পূজা নহে। পুরাতন বৈদিক ধর্ম্মের যে বহিরঙ্গ দিক তখন বিকশিত হইয়াছিল তাহা হইতেই গীতা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছে; গীতা এই বহিরঙ্গের উপসনাকে বলিয়াছে অন্যদেবতার প্রতি যজ্ঞ *; অন্যদেবতা যথা দেবান্, পিতৃন্, ভূতানি। মানুষ ভগবানের আংশিক শক্তি বা ভাবসকলকে যেমন দেখে বা ধারণা করে সেই সবের নিকটেই সাধারণতঃ তাহাদের জীবন ও কর্ম্মকে উৎসর্গ করে,—মানুষ বা প্রকৃতির মধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান জিনিব সহজেই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রধানতঃ সেই সবের অন্তর্দেবতারূপে অধিষ্ঠিত শক্তি ও ভাব সকলের উপাসনা তাহারা করিয়া থাকে, অথবা যে সব শক্তি ও ভাব উচ্চ দিব্য প্রতীকের ভিতর দিয়া তাহাদের নিজেদের মানবীয়তাকেই প্রতিফলিত করে সেই সবের পূজা করিয়া থাকে। যদি তাহারা শ্রদ্ধার সহিত ইহা করে, তবে তাহাদের সে শ্রদ্ধা সার্থক হয়; কারণ ভক্তের মনে ভগবানের যে প্রতীক, রূপ বা কল্পনা বর্ত্তমান থাকে, ভগবান তাহাই স্বীকার করেন, যং যং তনুম্ শ্রদ্ধয়া অর্চ্চতি, এবং তাহার মধ্যে যেরূপ শ্রদ্ধা আছে তদনুসারেই তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন। সকল আন্তরিক ধর্ম্মবিশ্বাস ও উপাসনা বস্তুতঃ সেই এক পরম বিশ্ব-পুরুষেরই উপাসনা; কারণ তিনিই মানুষের সকল যজ্ঞ ও তপস্যার প্রভু, তাহার সকল সাধনা ও উপাসনার অনন্ত ভোক্তা ‡। পূজার ধরন-

* যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥৯।২৩

‡ অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥৯।২৪

ধারণ যতই ছোট বা নীচ হউক, আত্মদান ও শ্রদ্ধা যতই অপূর্ণ হউক, নিজের অহংকে পূজা ও সেবা করিবার মায়া ও জড় প্রকৃতির বন্ধন ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা যতই সামান্য হউক, তবু ইহার দ্বারাই মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং একটা সাড়াও পাওয়া যায়। তথাপি জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও অর্পণ যেমনটী হয় ঐ সাড়াও তদনুরূপই হয়, সেই পূজা-উপাসনার ফলপ্রাপ্তি তদনুযায়ীই হয়, এ-সবের সীমাকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং একমাত্র যে মহত্তর ভগবদ্‌জ্ঞান জীবনলীলার সমগ্র সত্য দিতে পারে তাহার সহিত তুলনায় এই নীচের পূজা যজ্ঞের সত্য ও উচ্চতম বিধি অনুসারে অর্পিত হয় না। পরম ভগবদ্‌পুরুষকে তাঁহার সমগ্র সত্তায় ও তাঁহার আত্মবিকাশের সকল তত্ত্বে যে জানা সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ভিত্তির উপর এই অর্পণ প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা শুধু বহিরঙ্গের ও আংশিক আভাসের উপরেই অনুরক্ত, ন মাং অভিজানন্তি তত্ত্বতঃ। সেই জন্য এই যজ্ঞের উদ্দেশ্যও পরিচ্ছিন্ন ; প্রধানতঃ অহং এর সেবাই ইহার লক্ষ্য, ইহার ক্রিয়া ও অর্পণ আংশিক ও ভ্রান্ত, যজন্তি অবিধিপূর্ব্বকম্। স্বজ্ঞানে সমগ্রভাবে আত্মসমর্পন করিতে হইলে চাই ভগবানকে সমগ্রভাবে দর্শন করা ; নতুবা কেবল অপূর্ণ ও আংশিক জিনিষই পাওয়া যায় এবং সে-সবকে ছাড়াইয়া উঠিতে না পারিলে মহত্তর সাধনা ও প্রশস্ততর ভগবদ্ উপলব্ধির মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিতে পারা যায় না। কিন্তু যাহারা পরম বিশ্বপুরুষকেই একান্ত ও সমগ্রভাবে অনুসরণ করে, তাহারা অন্যান্য সাধনালব্ধ সমস্ত জ্ঞান ও ফল লাভ করে, কিন্তু কোনও এক বিশেষ ভাবের মধ্যে বদ্ধ হয় না, যদিও সকল ভাবের মধ্যেই ভগবান সম্বন্ধে কি সত্য আছে তাহা তাহারা দেখিতে পায়। এই সাধনা পরম পুরুষোত্তমের দিকে

যাইবার পথে ভগবানের সমস্ত ভাব, সমস্ত রূপকেই আলিঙ্গন করে ‡।

যে ভক্তি গীতা-কৃত সমন্বয়ের চূড়া, এই পূর্ণতম আত্মদান, এই ঐকান্তিক আত্মসমর্পণই সেই ভক্তি। সমস্ত কর্ম্ম ও চেষ্টা এই ভক্তির দ্বারা পরম বিশ্বপুরুষের নিকট অর্পণে পরিণত হয় *। "তুমি যে কর্ম্ম কর, যাহা ভোগ কর, যে যজ্ঞ কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর সে সকলই আমাতে অর্পণ কর।" এইরূপে জীবনের ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম ঘটনা, নিজ হইতে বা নিজের যাহা কিছু তাহা হইতে নিতান্ত মূল্যহীন দান, ক্ষুদ্রতম কর্ম্ম—সমস্তই তখন এক দিব্য সার্থকতা লাভ করে, সে অর্পণ ভগবানের গ্রহণ-যোগ্য হয়, সেইটিকেই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি ভগবদ্ভক্তের আত্মা ও জীবনকে অধিকার করেন। বাসনা ও অহং কর্তৃক সৃষ্ট সমস্ত ভেদ তখন দূর হয়। কর্ম্মের শুভ ফল লাভ করিবার জন্য উদ্বেগ থাকে না, অশুভ ফল এড়াইবার চেষ্টা থাকে না, কিন্তু সকল কর্ম্ম ও সকল ফল সেই পরম পুরুষে সমর্পণ করা হয় যিনি জগতের সমস্ত কর্ম্ম ও সমস্ত ফলের চির-অধিকারী, সুতরাং আর

---

‡ যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥৯।২৫

* পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতম্ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥৯।২৬-২৮

কর্ম্মবন্ধন থাকে না। কারণ পূর্ণতম আত্মসমর্পনের দ্বারা সমস্ত অহংমুখী বাসনা হৃদয় হইতে দূর হইয়া যায় এবং জীব অভ্যন্তরীন সন্ন্যাসের দ্বারা স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া ভগবানের সহিত পূর্ণভাবে যুক্ত হয়। সকল ইচ্ছা, সকল কর্ম্ম, সকল ফল ভগবানের হয়, শুদ্ধ ও বুদ্ধ প্রকৃতির ভিতর দিয়া দিব্যভাবে ক্রিয়া করে, সে-সব আর সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত অহংএর থাকে না। সীমাবদ্ধ প্রকৃতি এইভাবে সমর্পিত হইলে অসীমের মুক্ত অবাধ যন্ত্র হয়; জীব তাহার অধ্যাত্ম সত্তা লইয়া অজ্ঞান ও সীমাবন্ধন হইতে উঠিয়া দাঁড়ায়, অনন্তের সহিত তাহার ঐক্যে ফিরিয়া যায়। সনাতন ভগবান জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; তিনি সর্ব্বভূতে সমান এবং সমানভাবে সকল জীবের বন্ধু, পিতা, মাতা, স্রষ্টা, প্রণয়ী, ভর্ত্তা *। তিনি কাহারও শত্রু নহেন, কাহারও প্রতি তাঁহার পক্ষপাতী প্রেম নাই, কাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করেন নাই, কাহাকেও তিনি চিরকালের জন্য দণ্ডিত করেন নাই। বিনাকারণে খেয়ালী স্বেচ্ছাচারিতার বশে তিনি কাহাকেও কৃপা দেখান নাই; অজ্ঞান মায়ার মধ্যে ঘোরাঘুরি শেষ হইলে শেষপর্য্যন্ত সকলে সমানভাবে তাঁহার নিকট উপনীত হয়। কিন্তু কেবল এই পূর্ণতম ভক্তির দ্বারাই মানুষের মধ্যে ভগবানের বাস এবং ভগবানের মধ্যে মানুষের বাস সম্বন্ধে সজ্ঞান সচেতন হওয়া যায় এবং তাহা সর্ব্বতোমুখী পূর্ণতম মিলনে পরিণত হয়। উচ্চতম ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের যে প্রেম, তাহার দ্বারাই সর্ব্বোপেক্ষা সরল পথে ও সত্বরে ভাগবত ঐক্যে পৌছিতে পারা

---

* সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥৯।২৯

যায়। আমাদের সকলের মধ্যে সমান ভাবে যে ভগবান অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন তিনি প্রথমতঃ আর কিছুই চাহেন না, যদি এই সমগ্র আত্মসমর্পণ শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা ও পরিপূর্ণতার সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। সকলের পক্ষেই এই দ্বার উন্মুক্ত, সকলেই এই মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে; সেই বিশ্বপ্রেমিকের আলয়ে আমাদের লৌকিক ভেদবৈষম্য সমস্ত দূর হইয়া যায়। সেখানে পুণ্যবানকে বেশী আদর করা হয় না, পাপীকে ভগবদ্‌সান্নিধ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় না; এই পথ দিয়া পুণ্যবান সদাচারী ব্রাহ্মণ এবং অস্পৃশ্য পাপজন্মা চণ্ডাল সকলে এক সঙ্গেই যাইতে পারে এবং দেখিতে পায় যে, চরম মুক্তি ও অনন্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীবনলাভের দ্বার সকলের পক্ষেই সমান ভাবে উন্মুক্ত। ভগবানের সন্মুখে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই সমান অধিকার; কারণ পরমাত্মা ব্যক্তিত্বের বা সামাজিক ভেদাভেদের কোনও খাতির করেন না; সকলেই সোজাভাবে তাঁহার নিকট যাইতে পারে, [illegible] কোনও মধ্যস্থতার, কোনও বাধাসূচক সর্ত্তপূরণের প্রয়োজন হয় না। গুরু ভগবান, বলিলেন, * "অত্যন্ত দুরাচারও যদি অনন্যভাক্ হইয়া আমাকে ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকে সাধু বলিয়াই বিবচনা করা উচিত, কারণ সে-ব্যক্তির সাধনায় যে অবিচলিত সঙ্কল্প তাহা সত্য ও অখণ্ড। সে ব্যক্তি শীঘ্রই

---

* অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৯।৩০,৩১

ধর্ম্মাত্মা হইয়া উঠে এবং চিরশান্তি প্রাপ্ত হয়।" অন্য কথায়, পুর্ণ আত্মসমর্পনের যে সুদৃঢ় সঙ্কল্প তাহা আত্মার সকল দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় এবং প্রতিদানে লইয়া আসে মানুষের নিকট ভগবানের পুর্ণ অবতরণ ও আত্মদান, এবং তাহাই আমাদের নীচের প্রকৃতিকে দ্রুত দিব্যপ্রকৃতিতে রূপান্তরিত করিয়া আমাদের আধারের সকল অংশকে দিব্যজীবনের আদর্শে অবিলম্বে গড়িয়া তুলে। আত্ম-সমর্পণের ইচ্ছার যে শক্তি তাহা ভগবান ও মানুষের মধ্যস্থিত,- মায়ার আবরণ ঘুচাইয়া দেয়, ইহা সকল ভ্রান্তিকে নাশ করে, সকল বাধাকে ধ্বংস করে। যাহারা নিজেদের মানবীয় শক্তিতে জ্ঞান পুণ্যকর্ম্ম বা কৃচ্ছ আত্মসংযমের দ্বারা উর্দ্ধগতি লাভ করিতে চায়, তাহারা অতিকষ্টে সাতিশয় সংশয়ের সহিত অনন্তের দিকে অগ্রসর হয়; কিন্তু মানুষ যখন নিজের অহংকে, নিজের সমস্ত কর্ম্মকে. ভগবানে সমর্পণ করে তখন ভগবান নিজে আমাদের কাছে আসেন এবং আমাদের ভার গ্রহণ করেন। অজ্ঞানীকে তিনি দিব্যজ্ঞানের আলোক আনিয়া দেন, দুর্ব্বলকে তিনি ভাগবত ইচ্ছা শক্তির বল আনিয়া দেন. পাপীকে তিনি দিব্য পবিত্রতার মুক্তি আনিয়া দেন, দীন দুঃখীকে তিনি অনন্ত অধ্যাত্ম সুখ ও আনন্দ আনিয়া দেন। তাহাদের দুর্ব্বলতায়, তাহাদের মানবীয় শক্তির ত্রুটি বিচ্যুতিতে কিছুই আসিয়া যায় না। ভগবান বলিতেছেন, "নিশ্চয় জেনো, অর্জ্জুন, আমাকে যে ভালবাসে তাহার বিনাশ নাই।" পূর্ব্ব চেষ্টা ও উদ্যোগ, ব্রাহ্মণের শুচিতা ও পুণ্য, কর্ম্মে ও জ্ঞানে মহান্ রাজর্ষির জ্ঞানদীপ্ত শক্তি, এ-সবেরই মুল্য আছে কারণ দুর্ব্বল অপূর্ণ মানুষের পক্ষে এই উদার দৃষ্টি ও আত্মসমর্পণে উপনীত হওয়া এই সবের দ্বারা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, কিন্তু এরূপ উদ্যোগ না

থাকিলেও যাহারা প্রেমদাতা ভগবানের শরণাপন্ন হয় *—ধনোপার্জ্জনের সঙ্কীর্ণতা এবং ধান্যোৎপাদনের চেষ্টায় মগ্ন বৈশ্য, শত কঠিন বিধিনিষেধ পিষ্ট শূদ্র, সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ আত্মবিকাশে বাধাপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক, এমন কি পাপযোনি, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে যাহারা অতি নীচ কুলে পতিত, পারিয়া চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলেই তৎক্ষণাৎ তাহাদের সম্মুখে ভগবানের দ্বার উন্মুক্ত দেখিতে পায়। মানুষের বাহ্য মন যে সব বাহ্যিক ভেদবৈষম্যকে অতিবড় করিয়া দেখে, সে সব ভেদবৈষম্য অধ্যাত্মজীবনের মধ্যে দিব্যজ্যোতির সাম্য এবং নিরপেক্ষ ভগবানের অনন্ত অজেয় শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না।

পার্থিব জগৎ দ্বন্দে পূর্ণ এবং অনিত্য বাহ্যিক সম্বন্ধ সকলের দ্বারা বদ্ধ; মানুষ যতদিন এখানে এই সকল জিনিষে আসক্ত হইয়া বাস করে এবং এই জগৎ তাহাকে যেভাবে চালাইতে চায় সেইটিকেই নিজের জীবনের আদর্শনীতি বলিয়া গ্রহণ করে, ততদিন এজগত তাহার পক্ষে দ্বন্দ্ব, দুঃখ, যন্ত্রনার জগৎ, অনিত্যং অসুখম্ লোকম্। ইহা হইতে মুক্তির পথ হইতেছে বাহির হইতে ফিরিয়া অন্তর্মুখী হওয়া; জড় জগৎ যে মনের উপর চাপিয়া বসিয়াছে এবং মানুষকে দেহ ও প্রাণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে সেই জগতের সৃষ্ট মায়া হইতে ফিরিয়া সত্য ভাগবত সত্তার অভিমুখী হওয়া,—যে ভাগবত সত্তা আত্মার মুক্তির ভিতর দিয়া প্রকটিত হইবার অপেক্ষা করিতেছে। মায়াময়

---

* মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥৯।৩২,৩৩

মিথ্যা জগতের প্রতি যে প্রেম তাহাকে সত্যস্বরূপ ভগবানের প্রেমে পরিণত করিতে হইবে। একবার এই নিগূঢ় অন্তরতম ভগবানকে জানিতে ও ধরিতে পারিলে, সমগ্র সত্তা, সমগ্র জীবন অত্যুচ্চ গতি লাভ করিবে, অত্যাশ্চর্য্যভাবে রূপান্তরিত হইবে। বহির্মুখী কর্ম্ম ও দৃশ্যে মগ্ন নীচের প্রকৃতির অজ্ঞানতার পরিবর্ত্তে চক্ষু সর্ব্বত্র ভগবানকে দেখিতে পাইবে, আত্মার ঐক্য ও সার্ব্বভৌমিকতা দেখিতে পাইবে। জগতের দুঃখ ও যন্ত্রণা সর্ব্বানন্দময়ের আনন্দের মধ্যে লোপ পাইবে, আমাদের দুর্ব্বলতা, ভ্রান্তি ও পাপ অনন্ত ভগবানের সর্ব্বগ্রাহী, সর্ব্বরূপান্তর-সাধক শক্তি, সত্য ও পবিত্রতায় পরিণত হইবে। মনকে ভাগবত চৈতন্যের সহিত এক করা, অমাদের সমস্ত হৃদয়াবেগকে সর্ব্বভূতে বিরাজিত, ভগবানের প্রতি একান্ত প্রেমে পরিণত করা, আমাদের সকল কর্ম্মকে জগদীশ্বরের উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞরূপে পরিণত করা, আমাদের সকল পূজা উপাসনাকে একমাত্র তাঁহার প্রতি ভক্তি ও আত্মসমর্পণে পরিণত করা, পূর্ণযোগে আমাদের সমস্ত সত্তাকে ভগবদভিমুখী করা—ইহাই পার্থিব জীবন হইতে দিব্যজীবনে উঠিবার পন্থা *। ভগবদ্‌প্রেম ও ভক্তি সম্বন্ধে ইহাই গীতার শিক্ষা, ইহার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম ও হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পরম সামঞ্জস্যে মিলিয়া এক হইয়াছে, সকল সূত্র একত্র সংগ্রথিত হইয়াছে, এক অত্যুচ্চ সমন্বয় উদারতম ঐক্য সংসাধিত হইয়াছে।

---

* মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৯।৩৪

The Renaissance in India. Re 1-12.

In four luminous chapters the author has given the real meaning and trend of the present reawakening of India. The present renaissance is a new and decisive turn to the solution of the problems over which all mankind is labouring and stumbling.

Kalidasa. Re. 1

A monograph on the characteristic build of Kalidasa's aesthetic genius and the place the great poet occupies in the evolution of India's cultural life—an exemplar of the most penetrating character study and superb literary criticism.

"Who that is interested in Kalidasa can afford to miss this superproduction of Sri Aurobindo?"—*The Hindu.*

"It brings a new historical outlook and insight into the field of literary estimation,.........it surveys the post-Vedic history of India, and infers the three successive phases of development—characterised respectively as moral, intellectual and material—from the representative poets Valmiki, Vyasa and Kalidasa."—*Dr. R. Vaidyaratha Swamy.*

The Ideal of the Karmayogin. Re. 1-12.

Who can best serve Mother India? Those only who have a vision of the deep and underlying forces that are shaping her destiny, those who will offer their life and works, their all, as a sacrifice to the great Mother. These are the greatest of her children who would make her great.

War and self Determination. Rs. 2-8.

The subjects treated are of world importance, and the present ideals of humanity, are considered, especially the ideals of equality, commonalty and unity of mankind, the ideals of justice, equality and freedom.

THE ILLUSION OF THE CHARKA.

By Anil Baran Ray. Price Re. 1/4 only.

Discussing in full the injury done to the country by the *Khaddar* movement of Mahatma Gandhi, the author gives a comprehensive analysis of the deep and chronic poverty of the Indian masses as well as its truly effective remedy.

"Nine chapters in all make up the volume and they are all interesting reading. Sj. Ray's arguments which are supported by facts and figures cannot be summarily dismissed"—*The Amrita Bazar Patrika.*

"The book is worth being read by those who want to study the question from other than the sentimental point of view"—*The Mahratta* (*C. P.*).

"In this little book the author examines all the claims of the charka. The book is of special interest, because it is written by one who has worked heart and soul for *khadi* and who is now disillusioned. His criticism of the charka is therefore neither perverse, nor based on prejudice and ignorance."—*The Indian Review.*

"The author presents his case in a well-reasoned manner and his arguments deserve careful attention."—*The Modern Review.*

"A careful perusal of the book can lead to only one conclusion, viz, that Mr. Ray has demonstrated to the satisfaction of all candid and impartial persons that the *charka* programme is in the main a futile one"—*The Federated India* (*Madras*).

"Mr. Ray makes it plain that he continues to have the very highest respect for Mr. Gandhi though he relentlessly exposes that great leader's mistake in spousing a movement which is calculated to perpetuate rather than to relieve the poverty of the Indian masses"—*The Pioneer* (*Allahabad*).

"Mr. Ray's arguments are well-nigh irrefutable. The sooner our people break the illusion of the charka the better"—*The Prabuddha Bharata.*

Essays on the Gita.

First Series Rs. 5. Second Series Rs. 7-8

This is a masterly exposition, at once lucid, deep and spiritually puissant, bringing home to the modern mind the great Wisdom of the Gita, and serving as an invaluable guide to a higher divine life to be realised even on this earth.

"It is philosophy touched with lyricism, and Aurobindo Ghose's book is written throughout in easy excellent English which carries to a new perfection the difficult art of expounding Hindu thought to the West."—*The Statesman.*

"It seeks the highest truth for the highest practical utility" ....*The Pioneer.*

"It is throbbing with the luminous life of a prophet's message, it is instinct with something of the Gita's own *mantra-shakti*"—*The Forward.*

The same translated into simple Bengali by Anilbaran Ray ; Part I Re. 1-4 as; Part II Rs 2/8, Part III Re. 1-8 as; *Sree Aurobindo* says : "Your translation is indeed very good." *Dr. Dinesh Chandra Sen* says : "I can say with whole hearted sincerity that I have been much profited by a study of this Bengali book", Mr. S. D. Karandikar writes : "Your book to me is a great friend and it has brought a real and good change in my way of life."

The Mother. Re. 1.

In this small book, written in a simple poetical prose of wonderful grace, intensity and spiritual appeal, Sri. Aurobindo, "the last of the great Rishis", delivers his message to humamity. Read this book to form an idea of the *Sadhana* and work, carried on in his Asram at Pondicherry, which is steadily growing to be the centre of a world movement.

"........The lay public also will gather clearly from it some hints as to what the greatest sage of modern India has been living for in his place of quiet retirement for the last seventeen years nearly"—*The Forward.*